লক্ষ্মীর আগমন

'বনফুল'

লক্ষ্মীর আগমন

উৎসর্গ

শ্রীমতী লীলাবতী দেবী

করকমলে--

ভূমিকা

এই উপন্যাসখানি ১৩৬০ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় কিছু বদলেছি, কিছু বাড়িয়েছি।

বনফুল

ভাগলপুর
২৪শে কার্তিক, ১৩৬০

এক

অবনীশের কথা

অদ্ভুত রকম যোগাযোগ হয়েছিল সেদিন।

স্বপ্নলোক নেমে এসেছিল সেই পড়ো ডাকবাংলোর বারান্দায়। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছিল চতুর্দিকে, কোথায় যেন বাঁশী বাজছিল একটা। লণ্ঠনের আলোয় মৃদুলার কালো বেণীটা ভাষাময় হয়ে উঠেছিল। নিরু আর ফুলুর সঙ্গে গল্প করতে করতে সে তরকারি কুটছিল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। রাজু ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল; মাঝে মাঝে নাক ডাকছিল তার, কিন্তু তাতে, ইংরেজিতে যাকে বলে জারিং নোট, তা ছিল না, মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত-লোকের অস্পষ্ট কলরবের ঢেউ মাঝে মাঝে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে পরে একটা পোকা ডাকছিল 'চিপ্' 'চিপ্' 'চিপ্'!

গল্প বল্‌ছিল সুখেন্দু। কিন্তু গল্প বলার চেয়ে রান্নার দিকেই বেশী মন ছিল তার। সে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে তদারক করে' আসছিল মাংসের জলটা মরল কিনা। নামে রান্না করছিল শুকুল ঠাকুর, সুখেন্দুর নির্দেশ মতো সে কেবল খুন্তি নাড়ছিল, মশলা গুলছিল, হাঁড়ি নাবাচ্ছিল-ওঠাচ্ছিল, আঁচ কমাচ্ছিল-বাড়াচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরেছিল সুখেন্দু। সুখেন্দু চাটুজ্যে মুকুজ্যে বাড়ির ভাগনে, কিন্তু কর্তার মৃত্যুর পর সেই হয়ে উঠেছে সর্বময় কর্তা। অথচ সর্বময় কর্তা হবার মোটেই আকাঙ্ক্ষা নেই তার—নিজে বিয়ে করে নি, করবেও না—রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে তাদের বিষয়টি ভাল করে' বুঝিয়ে আর মৃদুলাকে একটি

সৎপাত্রে সম্প্রদান করে' সে তীর্থবাস করবে ঠিক করেছে। কিন্তু সকলেই জানে সে করবে না, করতে পারবে না। প্রথমত তার তীর্থবাস করবার বয়সই হয় নি (আমারই সহপাঠী সে, ত্রিশ কিম্বা বড় জোর বত্রিশ বছর বয়স হবে তার) দ্বিতীয়ত, রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে ছেড়ে থাকাই অসম্ভব তার পক্ষে। তৃতীয়ত তীর্থবাস করতে হলে যে পরলোকমুখী দৃষ্টি থাকা দরকার তা সুখেন্দুর নেই। ইহলোকের নিতান্ত তুচ্ছ সব খুঁটিনাটি নিয়ে ভরপুর হয়ে থাকাই ওর স্বভাব। যখন বাইরের বৈষয়িক ঝামেলা থাকত না অর্থাৎ যেদিন মকোদ্দমার জন্যে সদরে যাওয়ার প্রয়োজন হ'ত না বা দ্বিজুর একটা ভাল চাকরির চেষ্টায় তদ্বির করবার জন্য ছুটোছুটি করবার সুযোগ থাকত না, কিম্বা নায়েব মশাইকে ডেকে নিয়ে এসে পলু পোকার চাষ বা মৌমাছি পালন বা কলেকটিভ ফারমিং বা মোটর ট্রাকটার বা ওইরকম কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করবার বাই চাগত না, সেদিন সুখেন্দু বসে বসে হয় দড়ি পাকাত কিম্বা উল বুনত। সুখেন্দুর বোনা সোয়েটার, ব্লাউস এবাড়ির আত্মীয়-স্বজন সবাই পরেছে। রাজুকে একটা কাডিগান পর্যন্ত বুনে দিয়েছে। সরু মোটা বেঁটে লম্বা রঙীন সাদা নানারকম দড়িও পাকিয়েছে সে জীবনে অনেক। সেগুলো হাটে বিক্রি করেছে এবং সেই টাকা জমিয়ে রেখেছে পোস্টাফিসে। আমাকে বলছিল একদিন সেই টাকা দিয়ে ও মৃদুলার প্রথম সন্তানকে গয়না গড়িয়ে দেবে একটা। সুতরাং তীর্থবাস করবার মনোভাব নয় ওর। নিতান্ত ইহলৌকিক এবং বৈষয়িক রসেই ওর চিত্ত নিষিক্ত। ওর মতে তাই বাজে কাজ যাতে সংসারের কোন সুবিধা হয় না।

এই যে পিকনিকটা এর মূলেও যে সুখেন্দুর একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা বুঝতে আমার খুব দেরি

হয় নি। আমার মনে হয় যে গল্পটা ও আমাকে বলছিল সেটাও উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এসব উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত তখন পাই নি, পাওয়া সম্ভবই ছিল না। সেই পড়ো বাংলোয় সেই জ্যোৎস্নাকুল সন্ধ্যায় কোন কিছু বিশ্লেষণ করে' দেখতেই ইচ্ছে করছিল না আমার। আমার মনে হয় সুখেন্দু যদি গল্পটা আমার আপিসে আমাকে বলত আমি বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু সেই রহস্যময় পরিবেশে মনে হচ্ছিল জীবনের নিগূঢ় সত্যকে যেন প্রত্যক্ষ করছি. আমার জ্ঞানের পরিধি যে কতটুকু এবং বিদ্যার দৌড় যে কত স্বল্প এই নিগূঢ় সত্যটা সেদিন যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজের কাছে, স্পষ্ট হয়ে উঠে অবিশ্বাসের পথরোধ করে' দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল ''হ'তে পারে বই কি! কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বিনিদ্র ভক্তের সন্ধানে পৃথিবীতে সশরীরে নেমে আসেন এ কথা তো সুবিদিত। বিশ্বাসও করেন অনেকে। পুরোপুরি অবিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি আমার।''

এই আচ্ছন্ন মনোভাবের উপর লাগছিল জ্যোৎস্নার ঢেউ, লাগছিল দূরাগত বাঁশীর সুর, মৃদুলার বাঁকা বেণীটার অদৃশ্য স্পর্শ। অনেকক্ষণ পরে পরে যে পোকাটা 'চিপ্ চিপ্' করে ডাকছিল সে-ও যেন সাবধান করছিল আমাকে। বলছিল যেন, 'সাবধান, অবিশ্বাসের শ্যাওলায় পা দিলেই পিছলে পড়ে যাবে। সাবধান।' অনেকক্ষণ পরে পরে বলছিল, কিন্তু বলছিল।

সুখেন্দুর মন ছিল শুকুল ঠাকুরের দিকে, অথচ সে আমাকে গল্পটাও না শুনিয়ে ছাড়বে না। আমি আসতেই আমাকে বলেছিল, ''কি রকম জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ? আজ তোমাকে জ্যোৎস্না রাত্রিরই গল্প শোনাব একটা। গল্প নয়, সত্য কাহিনী। তুমি একটু বাগিয়ে ব'স দেখি

ওই কোণটায়। মৃ অনুপমকে চা দে এক কাপ। চা খাবে না কফি? ও শুকুল, মশলাটা খুব বেশী ভেজো না—এই মাটি করেছে”—সুখেন্দু ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। মৃদুলাকে সুখেন্দু ‘মৃ’ বলে’ ডাকে। মৃদুলার হাতের তৈরি চমৎকার এক পোয়ালা চা খেয়ে মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ওর সপ্রতিভতার কথা। বিদেশে ঘুরেছি অনেক। সপ্রতিভ মেয়ে অনেক দেখেছি। এদেশে, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে, লাজুক মেয়ে দেখব বলেই প্রত্যাশা করি, বিশেষ করে’ সে যদি নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা হয়। আশা করেছিলাম মৃ এক পেয়ালা চা হাতে করে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে আনত নয়নে আনত মস্তকে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির একটু আভা ফুটিয়ে আসবে এবং তেপায়ার উপর ঠক্ করে পেয়ালাটা নাবিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আশা করি নি যে সে এসেই বলবে, ‘‘না, এখানে বসা চলবে না আপনার। ওই কোণের দিকটায় চলুন আপনি। তেপায়াটা নিয়েই চলুন। বড্ড সিগারেট খান আপনি। ফুল্লুর সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য হয় না, কাসি আছে ওর—’’

এ আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার নির্দেশ অনুসারে যে কোণটায় গিয়ে বসতে হল সেখান থেকে মৃদুলার শুধু বেণীটাই নয়, মুখের খানিকটাও চোখে পড়তে লাগল, আর তার ঠিক পাশাপাশি উনুনের আঁচের ঝলকানিটাও। মনে হতে লাগল মৃদুলার ভিতর থেকেই বুঝি প্রদীপ্ত ঝলকটা বেরুচ্ছে। মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম, তার সপ্রতিভতার কথা, কিন্তু হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চক্রবাল রেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যের মাথায় একটি রূপোর নৌকো ভাসছে যেন। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, ওটা জ্যোৎস্না-মাখা একটা মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু বুঝতে

পেরে কষ্ট হল, যেন হতাশ হলাম। মনে হ'ল, আহা, ওটা সত্যিই যদি রুপোর ময়ূরপঙ্খী হ'ত আর সত্যিই যদি ওটা ভাসতে ভাসতে এসে আমাদের বারান্দার নীচে থামত, আর তার থেকে নেমে আসত—এর পর ছবিটাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে ছন্দপতন ঘটে গেল। মৃদুলা তো সর্বক্ষণ সামনেই বসে' রয়েছে, ও কি করে নামবে ওই রুপোর ময়ূরপঙ্খী থেকে! কিন্তু ও ছাড়া আর কাউকে ওই ময়ূরপঙ্খী থেকে নামাতে ইচ্ছেও হল না। সুতরাং কল্পনাটা এলোমেলো হয়ে গেল। আরও হ'ল সুখেন্দুকে দেখে। আমি যেখানে বসে-ছিলাম সেখান থেকে মৃদুলার মুখের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের খানিকটা অংশ এবং উনুনটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলাম শুকুল ঠাকুরকে সরিয়ে সুখেন্দু নিজেই খুনতি চালাচ্ছে। সিগারেট কেসের উপর অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ ঠুকে আমি অবশেষে চতুর্থ সিগারেটটি ধরালাম। অদৃশ্য কীটটি পুনরায় টিপ্পনি কাটলে —চিপ্ চিপ্ চিপ্।

পড়ো বাংলা, জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন রাত্রি, জ্বলন্ত চুল্লীর পট-ভূমিকায় মৃদুলার মুখের খানিকটা, মশলা ভাজার গন্ধ, সুখেন্দুর ব্যস্ততা, নিরু আর ফুলুর ফিস ফিস গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসি, মেঘের ময়ূরপঙ্খী, এই সমস্তই আমার চেতনায় ছাপ ফেলছিল, সাড়া তুলছিল, কিন্তু সবটা মিলিয়ে যা হচ্ছিল তা এদের কোনটার সঙ্গেই সম্পর্কিত নয় যেন। শাদা রঙের শুভ্রতার মধ্যে সাতটা রঙের একটারও আভাস পাওয়া যায় না। আমি যে অবর্ণনীয় একটা বেদনা অনুভব করছিলাম, যা শুধু বেদনাই নয় যা আনন্দও তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের হয়তো সম্পর্ক ছিল, হয়তো ছিল না। কিন্তু আমি একা একা নিজের সেই অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম। সুখেন্দু যে কখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তা আমি টের পাই নি। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের 'রামধ—ন' ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, কিছু দূরে

বেশ কিছু দূরে, একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে সুখেন্দু চীৎকার করছে। রামধন কে? রাজুর দিকে চেয়ে দেখলাম সে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। মৃদুলা রান্নাঘরে উঠে গেছে, ফুলু নিরুর কানে কানে কি যেন বলছে ফিস ফিস করে'। নিরুর মুখে মুচকি হাসি ফুটেছে। আশ্চর্য মেয়ে ওই নিরু। যদিও আমার সহোদরা বোন, কিন্তু ওকে যত দেখি তত আশ্চর্য হয়ে যাই। বেশ বুঝতে পারছি ওর মুখে যে মুচকি হাসিটা ফুটেছে সেটা পোশাকী হাসি, আটপৌরে হাসি নয়, ফুলু যে কথাটা রহস্যময়ভাবে তার কানে কানে বলছে তার জবাবে যতটুকু হাসি যেমন ভাবে হাসা উচিত, ঠিক ততটুকু হাসি তেমনিভাবে হাসছে ও। আমরা যে গরীব, ওকে যে স্কুলে চাকরি করে' গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে হয়, তা কি ওকে দেখে বোঝবার উপায় আছে? চমৎকার এক-খানি শাড়ি পরে', ছিমছাম হয়ে বসে আছে যেন রাজকন্যাটি। রুচির প্রশংসা করতে হয়। সুখেন্দুদের প্রতিবেশী শ্রীদাম সিংহির মেয়ে ফুলু যে ওর কড়ে' আঙুলের যোগ্যও নয় তা ও জানে, ইনজিনিয়ার শ্রীদামবাবুকে তোয়াজ করবার জন্যই যে সুখেন্দু তার ওই একমাত্র কন্যাটির প্রশংসায় গদগদ হয়ে ওঠে, যখন তখন নিমন্ত্রণ করে, এসব কথা নিরুর অবিদিত নেই, কিন্তু ফুলুর সঙ্গে ও এমনভাবে কথাবার্তা কইছে, যেন ফুলু ওর কত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'রাম ধ—ন', 'রাম ধ—ন' 'রাম—ধ—ন' সমানে চীৎকার করে চলেছে সুখেন্দু। রামধন ব্যক্তিটি কে এবং এখন এখানে তার প্রয়োজনই বা কি তা বোঝবার আমার উপায় ছিল না।

আমার যে সত্তাটা আমার মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল সুখেন্দুই তাকে হ্যাঁচকা মেরে তুললে আচমকা এসে।

"রাজু কি রকম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখেছ। ও বাহাদুরি করে' অনার্স নিয়েছে বটে কিন্তু ওর যা ঘুমের

বছর দেখছি তাতে আমি অন্তত ভরসা পাচ্ছি না। ওরে রাজু ওঠ না, তুই কি এখানে ঘুমিয়ে কাটাবি বলেই এসেছিস নাকি। বাড়িতে ঘুমোলেই পারতিস—"

এর উত্তরে রাজু পাশ ফিরে, মানে আমাদের দিকে পিছন ফিরে শুল। ফুলু মেয়েটি ঘাড় হেঁট করে খিল খিল করে হাসল। মৃদুলার গম্ভীর মুখশ্রীতে ভাবান্তর ঘটল না কোনও। আমি যেন ছায়াচিত্র দেখছিলাম প্রেক্ষাগৃহে বসে' বসে'।

সুখেন্দু হঠাৎ গল্পের প্রসঙ্গে উপনীত হল।

"আমি যে গল্পটা বলব সেটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। কিন্তু এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি, যে কোনও ভাল গল্প হার মেনে যাবে এর কাছে। সত্যি কিনা! তবে একটা কথা শুনিয়ে রাখি গোড়াতেই। এ গল্পের মর্ম বুঝতে হলে বিশ্বাসী মন চাই। নাস্তিক হলে চলবে না। তোমাদের সায়ান্সের ছেলেমানুষী অচল এখানে। কোন্‌খানেই বা চলে, বল। নীলা পাথরের কাণ্ড শুনেছ কখনও? নীলা যার 'সুট' করে তাকে রাজা করে দেয়, আর যার করে না তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখেছি আমি। জগৎকে তুমি তো চেন। একবার চুড়ির ব্যবসাতে ফেল মেরে তার সংসার অসচ্ছল হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর কে যেন তাকে বুদ্ধি দিলে তুমি নীলা পর দেখতে দেখতে অবস্থা ফিরে যাবে। আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলে। পরামর্শ চাইবার ছুতো করে এসেছিল অবশ্য, আসলে এসেছিল টাকা চাইতে। কোথায় যেন ভাল নীলার সন্ধান পেয়েছিল একটা—আসল রক্তমুখী নীলা—দাম আড়াই শ টাকা। আমাকে বললে টাকাটা ধার দাও আমাকে। আমার হাতে তখন টাকা কোথায়? মামা কিছুদিন আগেই মারা গেছেন, রাজুর পরীক্ষা সামনে, বিজুর পরীক্ষা সামনে, মামীর হার্টের অসুখ চলছে, মু-কে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়েছি, আমি

নিজেই তখন কই মাছের মতো ছটফট করে’ বেড়াচ্ছি টাকার জন্যে, কিন্তু জগ্ন নাছোড়বান্দা। টাকা তার চাই-ই, নীলা তাকে পরতেই হবে। আমি তখন তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের জুয়েলার পীতম্বরমের কাছে। সে বললে, বাবুজি ভাল নীলা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নীলা পরবার আগে এক-জন ভাল জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া দরকার। জগ্ন বললে, পরামর্শ নিয়েছি। ভগবানই জানেন কার কাছে ও পরামর্শ নিয়েছিল। নীলার আংটিটি পরে বাড়ি ফিরে এলেন বাছাধন। নীলার কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। নীলা পরার পর এক ঘণ্টাও কাটল না, ছোট ছেলেটা ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে অজ্ঞান। তাকে সামলাতে না সামলাতেই আদালত থেকে ‘শমন’ এসে হাজির, চুড়ির ব্যবসাতে যিনি ওর অংশীদার ছিলেন তিনি ওর নামে জুয়াচুরির নালিশ করেছেন। আদালতের সিপাহী বিদেয় হতে না হতেই সাইকেল চেপে টেলিগ্রাফ পিওন দর্শন দিলেন। দেশে বাপ মর-মর, আর্জেণ্ট টেলিগ্রাফ করেছেন যাবার জন্য। জগৎ তখন আংটিটা খুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে বাঁচল। তোমার সায়ান্স এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে? অথচ ঘটনাগুলো সত্যি, স্বচক্ষে দেখেছি।......”

সুখেন্দু হঠাৎ গেঞ্জিটা খুলে ফেলে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। কিন্তু পিঠের অজস্র ঘামাচি ওর মনকে যে একটুও অধিকার করে ছিল না তার প্রমাণ পেলাম যখন ও বলে’ উঠল—“আমার মনে হয় কি জানিস? জ্যোৎস্না জিনিসটা শুধু চাঁদের আলো নয়, ওটা সামথিং এলস্। যদি বলি আমাদেরই মনের আলো তাহলেও ঠিক হয় না অবশ্য, কারণ ঠিক পূর্ণিমা তিথিতেই মনে এরকম আলো বেরু-বার মানে কি? তুমি টপ করে চেপে ধরবে জানি—কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের মনের সঙ্গে ওর এই প্রকাশটার

ভীষণ যোগাযোগ আছে। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে ওই পাথরটা ঠিক আমাদের মতো জ্যোৎস্নাটা উপভোগ করছে না এটা নিশ্চিত। আমাদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে শুধু আলো নয়, অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, যেমন ধর চকোর—চকোর দেখেছিস কখনও? আমি কিন্তু দেখেছি, চকোর পাখী নয়, প্রজাপতি এক রকম—"

এমন সময় ন' দশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

বলল, "বাবা এখন বাড়ি নেই। মাঠ থেকে ফেরেনি এখনও।"

"ও, তাই সাড়া পেলাম না। ফিরলে বলে দিস্ আমরা এসেছি। সমস্ত রাত থাকব। তোরা এখানে সবাই খাবি আজ। তোর ভাইটা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।"

"তোর মা?"

"মায়ের আবার শরীর খারাপ হয়েছে।"

"তুই তাহলে বাবার সঙ্গে আসিস্। কেমন?"

"আচ্ছা।"

জ্যোৎস্না প্রসঙ্গে সুখেন্দু যে আবোল-তাবোল আরম্ভ করেছিল, মেয়েটি এসে পড়াতে তার রং বদলালো বটে, কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত রকমে যে আমি একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম।

"এই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে আমার ভাগ্য অদ্ভুতভাবে জড়িত। মা যেদিন মারা যান সেদিনও এমনি জ্যোৎস্না, বাবা যেদিন মারা যান সেদিনও। মামা যেদিন মারা যান সেদিন প্রথম রাত্রে চাঁদ ছিল না, কিন্তু ঠিক মারা যাবার সময়টিতে দশদিক আলো করে চাঁদ উঠল। আর মামী যেদিন মারা যান সেদিন তো তুইও ছিলি কোলকাতায়, মনে নেই? কোলকাতার ভিতর বলে তত বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু নিমতলা ঘাটে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম জ্যোৎস্নায়

ফিনিক ফুটছে। রাত দুটো হবে তখন, মনে আছে তোর? মেস থেকে তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম, সেই যে''

''মনে আছে। সেদিনও পূর্ণিমা রাত্রি ছিল''

''আশ্চর্য কান্ড। পূর্ণিমা রাত্রিতেই বেছে বেছে আমার জীবনে অন্ধকার এসেছে। অবশ্য একটি পূর্ণিমা রাত্রি ছাড়া। সেই গল্পটাই তোমাকে বলব আজ। নাম টাম বলব না কিন্তু, তুমি জানতেও চেও না। ওকি, শুকুল আবার আসছে কেন?''

শুকুল ঠাকুর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সসঙ্কোচে বললে, ''কালিয়ার ঝোলটা কি আর একটু মারব? আপনি যদি একবার দেখে যেতেন—''

"হুড় হুড় করে যে রকম জল ঢাললে তুমি ও মারতে গেলে আলুগুলো গলে' কাদা হয়ে যাবে। চল দেখি আলু বেশ সেদ্ধ হয়েছে তো''

"হয়েছে।"

সুখেন্দু উঠে গেল।

যখন ফিরল তখন দেখলাম সে একটা অংক কষছে।

"চুয়ান্ন মাইল আসতে ঘণ্টা চারেক লাগুক। পাঁচটায় যদি ছাড়ে নটা নাগাদ এসে পোঁছে যাবে। কি বল?"

''কার কথা বলছ?"

"দ্বিজুর। সে বলেছিল আসবে। তার মোটর বাইক আছে। আসবে খুব সম্ভবত। বিশেষত তুমি আসবে যখন শুনেছে—"

"দ্বিজু আপিস করেছে বুঝি?"

"সে কি আর করেছে, আমি জোর করে' করে দিয়েছি। নিজের কোলিয়ারি নিজেই দেখুক না, নিজের জিনিস নিজে না দেখলে চলে? দিনরাত খালি পলিটিকস্ আর খবরের কাগজ নিয়ে কাটালে সব যে উচ্ছন্ন যাবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো তো। এখনও মন বসেনি ওর ঠিক করে'।"

আমি অনেক দিন এদের কাছছাড়া। বিলেতেই চার বছর ছিলাম। তাই এদের পারিবারিক অনেক খবর জানা ছিল না।

"বিজু চাকরি করছে?"

"হ্যাঁ, প্রফেসারি। মাইনে বড্ড কম। তবু বসে' বসে' ভ্যারেণ্ডা ভাজার চেয়ে তো ভালো। খাবার পরবার অবশ্য অভাব নেই এদের, কিন্তু এরা এতো কাছা-খোলা যে সামলে সুমলে দেবার মতো হুঁশিয়ার লোক যদি সংসারে না থাকে, তাহলে এদের বিষয় সম্পত্তি থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই এদের প্রত্যেককেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কাজে লেগে থাকলে খানিকটা হুঁশ হয় তবু। বিজুটা সবচেয়ে বেশী অন্যমনস্ক। সেদিন গিয়ে দেখি বিজু একটা মোমবাতি জেবলে পড়ছে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। নিজে আমি বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন করিয়ে গেছি, মোমবাতি মানে! বিজুকে জিগ্যেস করতে সে কাচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয় নি বলে বোধ হয় কানেকশন কেটে দিয়েছে। টাকার অভাব নয়, হুঁশের অভাব। ইচ্ছে হল কান ধরে ঠাস করে একটা চড় মারি—"

ক্রুদ্ধ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল সুখেন্দু। যেন আমিই অপরাধী।

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান! চড় ওদের মারা যায় না। মারতে পারা যায় না। মারতে পারলে ওরা মানুষ হত। কিন্তু সেটি আর জীবনে পেরে উঠলাম না। আমিই তো ওদের মাটি করেছি। মামা তো সেই কবে মারা গেছেন আর মামী তো পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়েই রইলেন বরাবর। ভার তো ছিল আমার উপর। কিন্তু ওদের শাসন আমি কিছুতেই করতে পারলাম না।"

সুখেন্দু ঘন ঘন পা নাচাতে লাগল। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে বেশ খানিকক্ষণ পা নাচিয়ে টপ করে উঠে পড়ল

আবার। বারান্দার অন্ধকার কোণটার দিকে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝুড়ি বার করলে টেনে।

"মু এই দ্যাখ এইখানে রেখেছে মাটির গ্লাসগুলো। আমি তখন থেকে ভাবছি গ্লাসগুলো গেল কোথায়, আসবার সময় গাড়িতে তুলতেই ভুল হয়ে গেল, না কি হল—"

"ওগুলো এখন টেনে বার করছ কেন। আমিই তো ওখানে সরিয়ে রেখেছি, খাবার সময় বার করলেই হবে—"

"ধুতে হবে না?"

"ধুয়েই রেখেছি।"

সুখেন্দু আমার দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে একবার। তারপর ঝুড়িটা আবার গিয়ে কোণে রেখে এল।

"শুরু কর এবার তোমার গল্প—"

"হ্যাঁ করছি।"

এসে বসে আবার পা নাচাতে শুরু করলে। তারপর একটা রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "কোন্‌খান থেকে শুরু করি তাই ভাবছি। আচ্ছা, প্যাঁচা দেখেছিস তুই?"

"দেখেছি। ছবিতে—"

"জ্যান্ত প্যাঁচা দেখিস নি কখনও?"

"কি করে দেখব। তবে চিড়িয়াখানায় মনে হচ্ছে দেখেছি—"

"কত বড় দেখেছিস?"

"ঠিক মনে নেই। তবে খুব বড় নয়।"

"রং কি রকম?"

একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। প্যাঁচা নিয়ে যে হঠাৎ সুখেন্দু জেরা শুরু করবে তা কে জানত!

বললাম, "যতদূর মনে হচ্ছে মেটে মেটে—"

"তাহলে কুটুরে প্যাঁচা দেখেছ।"

"তা হবে—"

"কিন্তু আমি সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে যা

দেখেছিলাম তা ধবধবে শাদা। মনে হচ্ছিল সাদা মখমল দিয়ে মোড়া তার গা। চোখ দুটি হীরের মতো জ্বলছে। বেরালের চোখও অন্ধকারে জ্বলে—দেখেছ নিশ্চয়—কিন্তু সে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। মনে হচ্ছিল চোখ দুটি হাসছে, আর তার থেকে যে আলো বেরুচ্ছে তা যেন জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাও যেন নয়, অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ একটা জ্যোতি, যা দেখে ভয় হয় না, ভরসা হয়। আমি তো প্রথম ওই চোখ দুটোই দেখেছিলাম—"

গল্পে বাধা পড়ল।

রামধন এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, আমরা এই বাড়ি আর আশপাশের এই জমিগুলো কোন্ সালে কিনেছিলাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আঠারো বছর আগে—"

সুখেন্দু আমার দিকে চেয়ে বললে—"মনে রেখ কথাটা—"

তারপর রামধনের দিকে ফিরে বললে—"এই কথাটাই জানতে চাইছিলাম। একটু পরে তোমার মেয়েকে সঙ্গে করে এখানে এস। রাত্রে এখানেই খাবে।"

"যে আজ্ঞে।"

দণ্ডবৎ করে রামধন চলে গেল।

অপসৃয়মান রামধনের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সুখেন্দু বললে—"আমি যে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পটা বলতে যাচ্ছি তা এসেছিল ঠিক কুড়ি বছর আগে। মানে আমার বয়স তখন ন কিম্বা দশ। তোর সঙ্গে আমার আলাপই হয়নি তখন। ক্লাশ প্রমোশন পাইনি সেবার, মামার দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াই, চোখোচোখি হয়ে গেলেই মামা কটমট করে' তাকান আমার দিকে, আর আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা চলছে তখন..."

হঠাৎ চুপ করে' গেল সুখেন্দু। তারপর বললে, "মামীর মুখটা মনে পড়ছে। আশ্চর্য, একরোখা লোক ছিলেন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি মামাকে বলতে—দেখ, সুকুকে কিছু বোলো না। ফেল করে' বেচারা মনমরা হয়ে আছে, তার ওপর আমাদের আশ্রিত, তুমি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না। এ বিষয়ে একটি কথা বোলো না। মামা মুখ দিয়ে কিছু বলেন নি, বলেছিলেন চোখ দিয়ে। তাঁর সে কটমট চাউনি—বাপ্‌স্‌—জীবনে ভুলব না কখনও।"

সুখেন্দু জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগল আবার।

তারপর আবার মুচকি হেসে বললে—"মামার ওই চাউনিটাই কিন্তু সারাজীবন ঠেলে ঠেলে ঠিক রাস্তায় নিয়ে গেছে আমাকে। এখনও নিয়ে যাচ্ছে। চাউনিটার কটমট ভাবটা কমেছে কিন্তু মনে হয়। মনে হয় বুঝেছেন তিনি ব্যাপারটা এতদিনে। গেল বছরের ঘটনাটার পর বোঝা উচিত অন্তত। আহা, মামীও যদি থাকতেন তখন, ছিলেন নিশ্চয়ই কোথাও, আমি যদিও টের পাইনি সেটা। টের পেলে খুব ভালো লাগত। সারাজীবন মেয়েটাকে দাঁতে চিবিয়ে রেখেছিলেন তো—কিন্তু আসল কথা বুঝেছিলেন তিনি—"

পুনরায় চুপ ক'রে গেল সে। আকাশের দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। তার নীরবতাটা এমন একটা বিশেষ ধরনের নীরবতা বলে আমার মনে হল যে আমিও চুপ করে' রইলাম। কথা বলে তা ভেঙে ফেলবার প্রশ্নও জাগল না আমার মনে, নিতান্ত প্রয়োজন হলেও একটা দামী কাচের ফুলদানী ভেঙে ফেলবার কল্পনা করে না যেমন কেউ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কিছুক্ষণ আগে দিগন্তরেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যশীর্ষে যে ছোট মেঘের ময়ূরপঙ্খীটি ভেসে উঠেছিল, মনে হ'ল সেটি যেন

বেশ বড় হয়েছে, ময়ূরের গলাটি আরও স্পষ্ট, আরও বড় হয়ে উঠেছে যেন...

সুখেন্দুই নীরবতা ভঙ্গ করল শেষে।

"গেল বছরের ঘটনাটা এতই অদ্ভুত যে যখনই মনে হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে হাত দিয়ে দেখ"—

সুখেন্দু আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখল। অনুভব করলাম সত্যিই সে রোমাঞ্চিত হয়ে বসে আছে।

"গেল বছরের ঘটনাটা কি—"

"সাংসারিক ঘটনাই, টাকাকড়ির ব্যাপার, কিন্তু অদ্ভুত—"

"কি রকম—"

"তুই তখন বিলেতে। কোথাও কিছু নেই মকোদ্দমা বেধে গেল একটা। মকোদ্দমা আমরা বাধাই নি, বাধালে আমাদের শত্রুপক্ষ মল্লিকরা। আমরা কিছুদিন আগে যে কোলিয়ারিটা কিনেছিলাম—যে কোলিয়ারির আপিসে দ্বিজু আছে এখন—সেই কোলিয়ারিটা মল্লিকেরই নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু টপ করে আমিই কিনে ফেললাম সেটা এদের নামে, সে-ও এক রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরে বলব সেটা। মল্লিকের ছিল রাগ, সে এক দলিল বার করে কোলিয়ারিটা ক্লেম করে বসল। আমাদের উকিল ভজহরি সেন অভিজ্ঞ লোক। তিনি বললেন, মকোদ্দমা আমরা জিতবো, মকোদ্দমা লড়বার খরচ খরচাও উশুল হবে, লড়তে হবে কিন্তু। অর্থাৎ হাজার বিশ পঁচিশ টাকার দরকার। রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে গেলাম। তখন আমাদের হাতে শ' পাঁচেক টাকাও নেই। যাঁর কাছ থেকে কোলিয়ারি কিনেছিলাম, গেলাম তাঁর কাছে। তিনি সমস্ত শুনে হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন শুধু। মিনিট দু'তিন কোনও কথাই বললেন না। তারপর বললেন, "মল্লিকের কাছ থেকে আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার

নিয়েছি, একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু কোলিয়ারি বাঁধা রেখে ধার নিয়েছি এ কথাটা মিথ্যে। কিন্তু—"

আবার হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তারপর আর একটু হেসে বললেন "মল্লিককে দিয়েই দিন না কোলিয়ারিটা, আপনারা যে টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, তা সুদসুদ্ধ ফেরৎ পাবেন। ওর যখন ঝোঁক হয়েছে, নিতে দিন ওকে, তা না হলে আমাকে ও বিপদে ফেলবে। বলচে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম ওই কোলিয়ারির আশায়, আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ও বলছে ওই মর্মে আমি চিঠি নাকি দিয়েছিলাম ওকে, আমার ঠিক মনে নেই অবশ্য...মে বি"

আমি খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম শেষ পর্যন্ত। প্রথমত আমার আশ্চর্য লাগছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির কাহিনীর সংগে কোলিয়ারি-মল্লিক-ভজহরি-মকোদ্দমা এসবের সম্পর্ক কোথায়—কিন্তু সুখেন্দুকে তা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, বস্তুত ওর উৎসাহিত অনর্গল বক্তৃতায় বাধা দিতে মায়াই হচ্ছিল। ও এমনভাবে কথাগুলো বলছিল, ওর চোখে মুখে বলবার ভঙ্গিমায় এমন একটা তন্ময় ভাব ফুটে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল ও যেন গল্প বলছে না, স্তোত্র পাঠ করছে। আমি মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে বা 'ও' 'ও' বলে সায় দেবার ভান করছিলাম বটে কিন্তু বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গল্পের খেইও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে মজার আর আশ্চর্যের বিষয় খেই হারিয়েও যেন হারাই নি! আমার অন্যমনস্ক মন আমার অজ্ঞাতসারেই যেন খেইটা ধরেছিল। কানে যেটা ঢুকছিল না সেটা আমি যেন মনে করে তৈরী করে' নিচ্ছিলাম। কেন জানি না মনে আর একটা জ্যোৎস্না-রাত্রির ছবি জাগছিল। অদ্ভুত সে ছবিটা।

...নির্মেঘ আকাশে অনাবিল জ্যোৎস্না উঠেছে। আমি

দাঁড়িয়ে আছি নির্জন এক বিরাট প্রান্তরে। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। দিগ্বলয়ে যে সব তরুশ্রেণী সাধারণত তরঙ্গায়িত হয়ে দেখা দেয় স্থূল সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ রেখায়, তাও যেন নেই। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ সোজা যেন মাঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে! মাঠের মাঝখানে—ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত স্তূপের মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। মনে হচ্ছে ভুবনেশ্বরের মন্দির। এখানে কোথা থেকে এল? তারপর মনে হল সেটা কখনও ছোট, কখনও বড় হচ্ছে। আনন্দময় জীবনের মাঝখানে একটা সন্দেহের মতো যেন কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে! হঠাৎ কালো মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল। আলোকিত হয়ে উঠল মন্দির-দ্বার। কালো মন্দিরের গায়ে আলোকের চতুর্ভুজ ফুটে উঠল—আর সেই চতুর্ভুজের বুকে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন রূপসী কিশোরী একটি...মনে হল লক্ষ্মী...

সুখেন্দুর একটা কথা কানের ভিতর ঢুকে হঠাৎ তীরের মত বসে গেল যে...।

"সেই মেয়েটি কেবল বললে কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"কোন্ মেয়েটি—"

"সেই যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেদিন রাত্রে—"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—"

ভান করলাম আবার। কোন্ মেয়েকে কখন সে কিভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিল তা আমি শুনিই নি মোটে কিন্তু সে কথা সুখেন্দুকে বলতে পারলাম না।

সুখেন্দু বলতে লাগল—"আমি তার কথায় প্রথমে কানই দিইনি। এক অদৃশ্য হস্ত সেজন্য আমার কানটা মলে দিলে যখন ঘণ্টা দুই পরে পিওন চিঠি নিয়ে এল। আশ্চর্য হলাম, আমেরিকা থেকে কে চিঠি লিখতে পারে! চিঠিটা খুলে পড়লাম—যদিও তখন সেই অদৃশ্য হস্ত কান

মলছিল আমার—তবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তে হল। মনে পড়ল আমার মামার এক দূর সম্পর্কের ভাই, আমেরিকা পালিয়েছিল বহুদিন আগে। সে ভিতরে ভিতরে কবে লক্ষপতি হয়েছে, কবে মারা গেছে, কিছুই জানতাম না। আমেরিকা থেকে তার উকিল আমাদের জানাচ্ছে যে, সে মৃত্যুকালে দশলক্ষ টাকা রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে সমভাবে দিয়ে গেছে...। ঠুকে দিলাম মকোদ্দমা। জিতলামও। ভজহরি যা বলেছিল তাই হল।. ”

“চিপ্‌ চিপ্‌ চিপ্‌” টিপ্পনি কাটলে সেই অদৃশ্য পোকাটা।

এই রহস্যময় কীটকে ঘিরে আমার মন নতুন একটা স্বপ্নলোক সৃজন করতে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। উপর্যুপরি বাধা পড়ল কয়েকটা। ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ শব্দে নৈশ নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে’ মোটর বাইকে চড়ে’ দ্বিজু হাজির হল এসে, আর তার সঙ্গে প্রফেসার বিজুও। হঠাৎ ভূমিকম্প হলে লোকে যেমন দাপাদাপি করে সুখেন্দু তাই করতে লাগল। রাজু ঘুমুচ্ছিল উঠে বসল। এর সঙ্গে মিশল এসে একটা গন্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মৃদুলা নেই। ফুলু নিরুও নেই! তারপর নজরে পড়ল বারান্দার কোণের দিকে তোলা উনুনে মৃদুলা কি যেন ভাজছে মোড়ায় বসে। কাটলেট সম্ভবত। গন্ধটা অন্তত সেইরকম ছেড়েছে।

“আরে বিজু, তুইও এসেছিস, ভালই হয়েছে। মানে, তোর ছুটি যদিও, তবু ভাবলাম পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছিস—তা বেশ হয়েছে। এ বাইকটা কার? তোরটাতে তো সাইড্‌কার ছিল না—”

প্রশ্নটা দ্বিজুকেই করল সুখেন্দু। কিন্তু দ্বিজু এমন ভাব প্রকাশ করল যেন সে বধির। নিপুণভাবে গাড়িটিকে বারান্দার একধারে তুললে, মালকোঁচা খুললে, তারপর

আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে একবার। সুখেন্দুর দিকে চাইলেও না।

বিজু এগিয়ে এসে সম্বোধন করলে সুখেন্দুকেই।

"সুখেনদা, একটা ভারী মজার খবর আছে—"

"তুমিতো কেবল মজার খবর নিয়েই মশগুল আছ। কি খবর আনলে আবার!"

"সেদিন ইলেকট্রিক কানেকশন কে কেটেছিল জান? কোম্পানি নয়, ইঁদুর!"

"কি রকম—"

"আমি ওদের বিলটা আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে লিখে পাঠালুম যে কানেকশনটা ওরা যেন তাড়াতাড়ি করে দেয়। কলেজ থেকে ফোন করলাম একবার। ওরা বললে— ওরা কানেকশন কাটেনি। মানে ওরাও কাটতে ভুলে গেছল! তারপর একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এনে দেখি— একটা ইঁদুর চিলেকোটার ঘরটায় একটা তার কাটতে গিয়ে নিজেও মরেছে, আর ফিউজও করে দিয়েছে সব—"

"এখন ঠিক হয়ে গেছে তো।"

"হ্যাঁ—"

"বিজু, সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইকটা তুই কোথা থেকে আনলি! চেয়ে আনলি কারো—?"

সুখেন্দু ছাড়বার পাত্র নয়। দ্বিজু কিন্তু অন্যদিকেই চেয়ে রইল, যেন শুনতে পায় নি।

"চিপ্ চিপ্ চিপ্" মন্তব্য করলে পোকাটা আবার।

আমার স্বপ্নটা কিন্তু আর জমল না কিছুক্ষণের জন্য।

"বিজুদা যে আসবে তা আমি জানতাম। কাটলেটের আয়োজন আগে থেকেই করে' রেখেছি তাই—"

অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পিছন দিকে কথা কইল মৃদুলা। কথার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তার চুলের গন্ধও মিশল খানিকটা এসে। অচেনা গন্ধ, তবু মনে হতে লাগল

চেনা-চেনা। জবাকুসুম? কেশরঞ্জন? লক্ষ্মীবিলাস? ম্যাকেসার? না, একটাও না। চেনা, অথচ অচেনা! সুখেন্দু কিন্তু না-ছোড়।

"দ্বিজু এ বাইকটা কোথা পেলি তুই?"

দ্বিজু মুখটা উঁচু করে' গলাটা চুলকোতে লাগল।

জবাব দিলে বিজু—"দাদা এটা নতুন কিনেছে।"

"নতুন কিনেছে? নতুন? মানে?"

দ্বিজু পিছন দিকের বারান্দায় চলে গেল।

"কি জানি। এটাতে সাইড্‌কার আছে বলে' বোধ হয়।"

"সাইড্‌কার নিয়ে কি হবে?"

"কি জানি—"

"টাকা কি খোলামকুচি? পুরোনো বাইকটা কি করলে?"

"বেচে দিয়েছে"।

"কততে—"

"সাড়ে পাঁচশ"।

"কিনেছিল ন'শ' টাকায়। সাড়ে তিনশ' টাকা এমন-ভাবে লোকশান করার মানে—? কোথায় গেল দ্বিজু?"

দ্বিজুর পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলাও নিঃশব্দে চলে' গেছে।

"এটার দাম কত—"

"সাড়ে বারোশ'—"

দ্বিজুই উচ্ছন্ন দেবে সংসারটা। এত টাকা ও পাচ্ছে কোথায়? ব্যাংকের একাউন্ট তো আমার নামে। ধারে কিনছে নিশ্চয়। দ্বিজু, দ্বিজু, কোথা গেলি তুই—"

সুখেন্দু ডাকতে ডাকতে পিছন দিকের বারান্দায় চলে' গেল। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব। চেয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। একটা নীরব হাসিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেন চারিদিক।

দুই

বিজেনের কথা

নিরু ঠিক ভাবছে আমি ওর জন্যেই এসেছি। অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি ওর জন্যে আমি আসিনি। দাদার আপিসে যখন বিকেলে গেলাম তখনও জানি না যে এখানে আসব, সুখেনদা যে এখানে পিক্‌-নিকের আয়োজন করেছেন, অবনদা যে নিরুকে নিয়ে এসেছেন, এসব কিছুই জানতাম না আমি। সুখেনদা আমাকে খবরটা কেন দেন নি কে জানে! অথচ দাদাকে দিয়েছেন। ভাগ্যে দাদার আপিসে গিয়েছিলাম, আর ভাগ্যে দাদা সাইড্‌কার-ওলা নতুন বাইকটা কিনেছে, তাই এখানে আসা হল। নিরু আসবে জানলে বইটা নিয়ে আসতাম। নিরু লিখেছিল ব্র্যাড্‌লের 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক' প্রবন্ধটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে। আমি যদি তাকে ব্যাপারটা সরলভাবে বুঝিয়ে দি তা হলে উপকার হয় তার। অর্থাৎ সে আশা করেছিল চিঠি লিখে লিখে বুঝিয়ে দেব তাকে, কিন্তু আমার সময় কই চিঠি লেখবার। এখানে আসব জানলে বইটাই নিয়ে আসতাম। দাদার সাইড্‌কার-ওলা বাইকটাই নিয়ে এল আমাকে, আমি আসি নি। দাদা হঠাৎ সাইড্‌কার-ওলা বাইক কিনে ফেললে কেন? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, তখন লক্ষ্য করিনি এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি আসব বলাতে দাদা সোজাসুজি 'না' বলতে পারলে না যদিও, কিন্তু খুব খুশীও হয় নি। আমাকে বললে, তুই যেতে চাইছিস, কাল সকালেই তোর কলেজ না? আমার তো ফিরতে ন'টা দশটা বেজে যাবে। তুই কলেজ যাবি কি

করে!" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "যাব না, না হয়। একদিন কামাই করলে আর কি হয়।" দাদা ভুরু কুঁচকে রইল, কোন উত্তর দিলে না। এখন মনে হচ্ছে, দাদা সাইড্‌কারটা কি মনে মনে আর কারও জন্যে রিজার্ভ করে' রেখেছিল নাকি!...চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। 'চমৎকার' বলছি কারণ ওর চেয়ে ভাল কথা জানা নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে রোদ আজ দিনে পৃথিবী পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাই চাঁদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে জ্যোৎস্নায় রূপায়িত হয়েছে। জিনিসটা একই কিন্তু প্রকাশ দু'রকম। একই বিষয় নিয়ে দু'জন কবি যেন দু'টো কবিতা লিখেছেন। নিরুকে এখন কাছে পেলে ভাল হ'ত, 'কবিতার জন্যই কবিতা'—ব্র্যাড্‌লের এই প্রবন্ধের মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতাম। চাকরটা বললে 'টুনটুনি' নদীর ধারে ফুলুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে। খাবার কত দেরি কে জানে! সুখেনদা এত রাত্রে আমার জন্যে পায়রা খুঁজতে বেরিয়েছে শুনলাম। পায়রার মাংস আমার খুব প্রিয় বটে, এ অঞ্চলে পাওয়াও যায় খুব শুনেছি, কিন্তু এতরাত্রে খোঁজাখুঁজির দরকার ছিল না। কিন্তু সুখেনদাকে মানা করবে কে! আমি টিলার উপর এসে বসেছি, ওরা আমাকে খুঁজে পাবে তো! চমৎকার টিলাটা কিন্তু। চারদিকেই ছোট বড় নানা-রকম টিলা। এই টিলাটা সব চেয়ে চমৎকার। কে জানে এই সবের তলাতেই কোনও মহেঞ্জোদাড়ো আত্মগোপন করে' আছে হয় তো। সুখেনদা জায়গাটা যখন কিনেছিল তখন কিন্তু অনেকে মানা করেছিল। বলেছিল এটা নাকি কোন পাঠান-সেনাপতির আমলে কবরস্থান ছিল। তাঁর হারেমের হাজার কয়েক বেগম নাকি সমাধিস্থ হয়েছিলেন এখানে। সুখেনদা অবশ্য শোনেন নি কিছু। সুখেনদা কারও কথা শোনেন না। জায়গাটা ভালই। এখানে যখনই এসেছি ভাল লেগেছে। ভয় করে নি কখনও। একটা

মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি যেন। হারেমের কবরখানা বলেই হয়তো মুক্তির আবহাওয়া চতুর্দিকে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। আকাশে কি উড়ছে ওগুলো? খুব ছোট পাখীর মতো। চকোর? চকোর বলে' সত্যি কোন পাখী আছে কি! আছে নিশ্চয়, তা না' হলে কবিরা লিখেছেন কেন। কিন্তু পরী আছে কি? ডানা-ওলা পরী? কবিরা পরীর কথাও কম লেখেন নি। কবিদের কাব্যলোকে এমন সব খবর থাকে যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই, অস্তিত্ব থাকবার দরকারও নেই, কিন্তু তবু তারা আছে, চিরকাল থাকবে। বাস্তব জগতে টেরোড্যাক্‌টিল্‌ ছিল এককালে, এখন নেই। পরীরা কিন্তু বরাবর আছে, বরাবর থাকবে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। টুনটুনি নদী কতদূর এখান থেকে! ওকি, বাইকে চড়ে' দ্বিজুদা চলল কোথায় এখন। নিমাইবাবুর কাছে নাকি? নিশ্চয় নিমাই-বাবুর কাছে। যাবে বলছিল...।

তিন

দ্বিজেনের কথা

মোটর বাইক জিনিসটার আর সবই ভালো, একটি দোষ ভয়ানক শব্দ করে। ওতে চড়ে' গোপনে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। বেরুবার মুখেই সুখেনদা ধরে ফেললে। সুখেনদা শুকুল ঠাকুরকে নিয়ে একগাদা পায়রা ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। গরম জল, পেট্রোম্যাক্স নিয়ে হৈ হৈ করছিল দক্ষিণ দিকের মাঠটায়, আমি ভাবলাম এই সময় সরে পড়ি, নিমাই ডাক্তারকে নিয়ে আসি, তারই মারফত কথাটা পাড়ব আজ সুখেনদার কাছে। নিমাই সেনের কথা সুখেনদা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু বাইকে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট আওয়াজ হল—ছি—ছি—ছি—ছি! সুখেনদা ছুটে এলো।

"কোথা বেরুচ্ছিস এখন?"

"নিমাইকে নিয়ে আসি—"

"নিমাইকে পাবি কি এখন! তাছাড়া আমাদের কুলুবে কিনা, বিজু একস্ট্রা হয়েছে, রামধন আর তার মেয়েকে খেতে বলেছি, ফুলুর আসবার কথা ছিল না সে-ও এসে গেছে। শুকুল কুলুবে তো?"

"মাংস পাঁচ সের আছে। পায়রা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—আটটা আছে। পায়রায় কম পড়বে। ঘি-ভাতেও কম হবে।"

সুখেনদা অকারণে ধমকে উঠলেন শুকুলকে।

"ঘি-ভাত চড়িয়ে দাও এখুনি। রামধন পায়রা আনছে আরও। সুখিয়াদের বাড়িতে গেছে সে—কম পড়লেই হ'ল!"

''তাদের তো অনেক পায়রা—"

"তবে ভাবছ কেন?''

শুকুল জবাব না দিয়ে কর্তিত-কণ্ঠ পায়রাগুলোকে গরম জলে ডোবাতে লাগল।

সুখেনদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বেশী দেরি কোরো না যেন। পায়রার মাংস পনেরো মিনিটে হয়ে যাবে। যাবে আর আসবে।"

সাধারণত আমি মিছে কথা বলতে চাই না, তাই কোন উত্তর না দিয়ে বাইকে সোয়ার হলাম। নিমাইয়ের বাড়ি পেঁাছেই নিমাইকে টপ করে তুলে নিয়ে চলে' আসব এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে হয় কোনও! নিমাই কি একটা নির্জীব পদার্থ যে তাকে টপ করে তুলে বাইকের পিছনে বেঁধে নিয়ে আসব? সে ডাক্তার লোক, বাড়িতেই নেই হয়তো! টেলিগ্রাফ করবার কিম্বা ফোন করবার সুবিধে থাকলে আগে থাকতে তাই করতাম, কিন্তু সে সুবিধে যখন নেই, তখন কপালের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে আজ পূর্ণিমা রাত্রি। পূর্ণিমা রাত্রিতে নিমাই কোথাও বেরুতে চায় না সাধারণত। ছাতের উপর বসে থাকে চুপ করে। ঘুমোয় না শুনেছি। অথচ কবি নয়। আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাইবে কি না কে জানে! তবে জ্যোৎস্না উপভোগ করাই যদি ছাতে বসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে, এই মাঠে, সেটা আরও ভালভাবে করতে পারবে। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে কি একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিল ও কিছুদিন আগে, তারপর থেকেই এইরকম হয়েছে শুনেছি। নিমাই কবি নয়। বরং একটু কাঠ-খোট্টা ধরনের। বিয়ে করেনি। কলেজে শুনেছিলাম একটা উড়ো খবর, কিন্তু সেটা উড়ো খবরই সম্ভবত। প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবার ছেছে ও নয়, নামটা যদিও নিমাই। আমার ভয় নিমাই হয়তো আমার প্রস্তাবে রাজিই

হবে না। হয়তো বলবে সুখেন্দু চাটুজ্যে আমার কথায় ওঠে-বসে বলেই যে তাকে ওঠ-বোস করাতে হবে এর কোন মানে নেই। সে আমাকে ভালবাসে বলেই ওঠ-বোস করে, ভালবাসাটাকে নির্যাতনের অস্ত্র করা উচিত হবে কি? নিমাই যে ঠিক কি ভাবে জিনিসটা নেবে তা বুঝতেই পারছি না। হয়তো সোৎসাহে রাজি হয়ে যাবে, কিম্বা হয়তো বলবে, না ভাই তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে আমাকে টেনো না, জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে লম্বা বক্তৃতাও দিয়ে দিতে পারে, কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাকে আমি রাজি করবই। না করলে চলবে না। আমি কিছুতেই সুখেনদাকে বলতে পারব না। আর এক সমস্যা হচ্ছে মৃ। মৃ-র অভিমতটা কি হবে তাও অনিশ্চিত। নিরুর মারফত জানতে হবে সেটা; নিরু ফুলুকে নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেল, একজনকেও ধরতে পারলাম না। এই সুযোগে, মানে আজ রাত্রেই, মৃ-কেও কথাটা বলতে পারলে ভাল হয়। তার যদি আপত্তি থাকে তাহলেই তো মুশকিল। তার আপত্তির সঙ্গে সুখেনদার আপত্তি মিলিত হলে বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে সেটা। কিন্তু আন্দাজে মনে হয় মৃ আমার দিকে। সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইক কেনবার টাকাটা তা না'হলে দিত না। টাকাটা দেবার সময় যে মিষ্টি মুচকি হাসিটা হেসেছিল তা সিগ্‌নিফিকাণ্ট! আমার আশ্চর্য লাগে, মৃ টাকা পায় কোথা! সুখেনদা দেয় নিশ্চয়। কিন্তু সুখেনদাকে যতদূর জানি বাজে খরচ করবার মতো অজস্র টাকা মৃকে দেবে তা-ও তো মনে হয় না। মৃ-র কাছে কিন্তু টাকা চাইলেই পাওয়া যায়। রাজুকে ছ'টা সিল্কের পাঞ্জাবী করিয়ে দিয়েছে, মানে প্রায় দু'শ টাকার ধাক্কা। সুখেনদা এ নিয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু মনে হ'ল করতে হয় বলে' করছিল, আসলে মৃ-র ওপর চটা সুখেনদার পক্ষে অসম্ভব।

চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ কিন্তু। মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভিতর থেকেই একটা আলো ফুটে বেরুচ্ছে, জোনাকীর গা থেকে যেমন ফুটে বেরোয়। ছি ছি কি ভীষণ শব্দ করছে আমার এই গাড়িটা। ফুলুকে সাইড্-কারে বসিয়ে এক চক্কোর দিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হবেনা দেখছি। অন্যান্য বাধা তো আছেই, ফুলুও রাজি হবে না। এই মাঠটা যদি সমুদ্র হ'ত আর এই বাইকটা হ'ত যদি মোটর-বোট তাহলে...টিলার উপর বসে' আছে একজন। ফুলু নয়, নির্জন মাঠে একা টিলার উপর বসে' থাকার মতো সাহস নেই ওর। কে ও? বিজু এসেছে বোধ হয়। কবি লোক কবিতার মিল খুঁজছে বোধ হয়। জ্যোৎস্নার সঙ্গে কিসের মিল হতে পারে? আমার জানা তো কিছু নেই। তবে 'চাঁদিনী' বলে' একটা কথা আছে, তার সঙ্গে 'কাঁদিনি' 'বাঁধিনি' মেলান যায় অনায়াসে। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা হবে? সত্যি কথা হচ্ছে 'কেঁদেছি' 'বেঁধেছি'।

চার

নিরুর কথা

বিজুদা আসবে জানলে আমি অন্তত আসতাম না। উপর্যুপরি চারখানা চিঠি লিখেছি—দরকারী চিঠি—পড়াশোনার ব্যাপারে—কিন্তু একটারও উত্তর দেয়নি। ইস্কুলে মাস্টারি করতে করতে প্রাইভেটে এম-এ দেওয়া যে কি ব্যাপার তা বিজুদার অন্তত বোঝা উচিত। একটারও উত্তর দিলে না কি বলে। 'আর্ট ফর আর্টস সেক্' 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক্' সোজাসুজি সংক্ষেপে বোঝা যায়। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে আমার সেই সংক্ষেপে বোঝাটা বিস্তৃত করে বোঝাই কি করে! আর সেই বোঝানর উপরই নির্ভর করছে নম্বর, মানে ডিগ্রী। বেশ খানিকটা লিখতে হবে আর সে লেখাটা আবোল তাবোল হলে চলবে না। আসলে ওসব ব্যাপারে আবোল তাবোলই বকে সবাই কিন্তু সেটাকে এমন একটা ভদ্র চেহারা দিতে হয় যাতে লোকে মনে করে জ্ঞানগর্ভ কিছু বলা হল বুঝি। বিজুদাকে অত করে' অত বার লিখলাম যে সোজা করে লিখে দাও কিছু, মুখস্থ করে ফেলি। উত্তর দিলে না। ওর সামনে বসে' থাকা যায় কখনও? ফুলু আসাতে সুবিধে হয়েছে। অসুবিধেও হয়েছে। ও এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করেছে যা দুরূহ ঠিক নয়, কিন্তু এখানে—এই টুনটুনি নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাত্রে বেমানান। কিন্তু ও ছাড়বে না। ব্যাগে করে নিয়ে এসেছে সব, এমন কি টর্চ পর্যন্ত। এত লোক থাকতে আমাকেই বা এ বিষয়ে পারদর্শী ঠাওরালে কেন ও কে জানে! ফুলুকে চটাতেও চাই না, ওর দাদার

কাছ থেকে বই আদায় করতে হবে কয়েকখানা। ব্র্যাড্‌লের বইখানা ওর দাদাই দিয়েছে।

"দেখ না নিরুদি, তুমি কি ভাবছ বল দেখি জলের দিকে চেয়ে চেয়ে।"

ফুলু বই খুলে তার উপর টর্চের আলো ফেলেছে।

"আমি এই পানি-শঙ্খ প্যাটার্নটা করতে চাই। ভাল হবে না? গোট-বরফিট কিন্তু আরও ঠাস মনে হচ্ছে নয়?"

"কি করবে তুমি—"

"সোয়েটার। কাউকে বোলো না যেন।"

"তাহলে গোট-বরফি কর।"

"পানি-শঙ্খ নামটা কিন্তু বেশ। নামটার জন্যেই করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওটা। পানি-শঙ্খ বেশ নামটা, নয়?"

"হ্যাঁ, বেশ। পানি-শঙ্খও খারাপ হবে না—"

পানি-শঙ্খ খারাপ হবে কি হবে না তা আমার জানা নেই, কখনও করিনি, দেখিনিও। কিন্তু ফুলুকে চটাতে চাই না।

"আচ্ছা কি রং মানাবে বলতো? ফিকে সোনালী, না, ফিকে সবুজ? না বাদামী—"

"কে পরবে, মেয়ে না পুরুষ?"

ফুলু চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তার পরে বলল "পুরুষ। বোলো না যেন কাউকে"—মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপলে একটু।

"পুরুষদের বাদামী বা ছাই ছাই রঙ মানাবে—"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। বাদামীই করি তাহলে। কি বল?"

"কর। উল কেনা হয়েছে?"

"হয়েছে, তিন রকমই কিনেছি। সঙ্গে এনেওছি।"

"ও—"

"পানি-শঙ্খই করি তাহলে, কি বল। আজই শুরু করি—"

"এখানে কোথা বুনবে?"

"রামধনদের ওখানে যাই চল। বেশ, নিরিবিলি ওখানটা। তাই চল নিরুদি।"

ফুলু আমাকে দিদি বলে কিন্তু ও আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়। প্রথম যখন বলেছিল গা জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু অমন অনেক গাত্রদাহ সহ্য করতে হয়েছে জীবনে। মধ্যবিত্তদের সহ্য করতে হয়। রোজ যখন স্কুলে যাই ডাইনে বামে পিছনে সামনে মোটরগাড়ির হর্ন আর পথচারী জনতার হ্যাংলা চাউনি—শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও, মেয়েরা মেয়েদের আরও খুঁটিয়ে দেখে, সে দেখার মধ্যে ঈর্ষাই থাকে না সব সময়ে, হ্যাংলামিও দেখেছি—এসব তো সহ্য করতেই হয় রোজ। করুণাদির কথাটা মনে পড়ে, করুণাদি বলত—যার যত সয়, তার তত জয়। করুণাদি যদিও জয়লাভ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, সকলের জন্য সহ্য করতে করতে যক্ষ্মাই হল বেচারার। স্যানাটোরিয়মে যেদিন মারা যায় সেদিন কাছেও কেউ ছিল না। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ওই রকমই হয়। করুণাদি যদিও হেরে গেছে কিন্তু করুণাদির কথাটার দাম একটুও কমেনি সেজন্য। "যার যত সয়, তার তত জয়"—বহুমূল্য কথা এটা। নিজের জীবনেই বুঝতে পারছি। পিসীমার লাথি ঝাঁটা সহ্য না করলে কি পড়াশোনা হত কিছু? আজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হ'ত!

"জলের দিকে অমন ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ তুমি নিরুদি—"

"দেখছি দিনের আলোয় যে টুনটুনিকে গরীবের

মেয়ের মতো দেখায়, চাঁদের আলোয় সেই টুনটুনিকে রাজার মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।"

"তা দেখাক, চল আমরা রামধনের বাড়িতে যাই। তোমার কাছেই শুরু করি সোয়েটারটা।"

"আমার তো রামধনের সঙ্গে আলাপ নেই মোটে। যাওয়া কি ঠিক হবে? তার স্ত্রীর শরীরও খারাপ শুনলাম—"

"তাতে কি হয়েছে। আমাকে খুব খাতির করে ওরা। আমার বাবার খুব অনুগত কিনা। বাবার আন্ডারেই রামধন কাজ করে তো। গেলে খুব খুশি হবে।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম। সোজাসুজি 'না' বলবার ক্ষমতা নেই, ফুলুর দাদার বইগুলো না পেলে পরীক্ষাই দেওয়া হবে না আমার। অথচ উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এই নদীর ধারে—। ফুলুটাকে সঙ্গে না আনলেই হ'ত। বড়লোকের মেয়েতো, অত্যন্ত একগুঁয়ে। যেটা ধরবে সহজে ছাড়বে না। এখন এখানে এসে সোয়েটার বোনবার মানে হয় কোনও?

"রামধন কি কাজ করে তোমার বাবার আন্ডারে—"

"কুলি খাটায় সম্ভবত। এই কাছেই কোথায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বাবা সেটার কনট্র্যাকট্ নিয়েছেন কিনা, সুখেনবাবুরও শেয়ার আছে তাতে শুনেছি। সুখেনবাবুই রামধনকে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন।"

হঠাৎ ফুলু থেমে গেল।

"সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছ তুমি নিরুদি—?"

"সিগারেটের? হ্যাঁ, পাচ্ছিতো।"

সত্যিই একটা মিষ্টি সিগারেটের গন্ধ কখন যে ধীরে ধীরে এসে আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, টেরই পাইনি আমরা। সিগারেটের এ গন্ধটা চেনা, অত্যন্ত চেনা, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে গন্ধটার সঙ্গে, বিজুদা এসেছে নিশ্চয়। ঘাড়

ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, কাউকে দেখা গেল না। নদীর পাড়টা এক জায়গায় হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে, ওর আড়ালে বসে' আছে নাকি কেউ। বিজুদা কি? গন্ধটা বিজুদার সিগারেটের। অত্যন্ত চেনা গন্ধ। বিজুদা যদি এসে থাকে উঠতে হবে এখান থেকে। কথা বলব না ওর সঙ্গে।

ফুলু চুপি চুপি বললে—"একটা কথা জানো নিরুদি? এ জায়গাটা নাকি ভুতুড়ে। কবরস্থান ছিল নাকি এককালে। ভয় করছে আমার, চল উঠি এখান থেকে—"

উঠলাম কিন্তু যেতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। এদিক ওদিক চাইলাম আবার। কেউ নেই।

"চল, ওদিকে যাচ্ছ কোথা। রামধনের বাড়ি এদিকে—"

আমি কিন্তু যাচ্ছিলাম নদীর পাড়টা হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে যেখানে সেই দিকে। কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। উঁচুটার আড়ালে বসে আছে একজন।

"কে, বিজুদা নাকি—"

"না আমি।"

"ও রাজু? তুমি এখানে একা বসে কেন?"

"এমনি। খাওয়ার দেরি আছে দেখে ভাবলাম বেড়িয়ে আসি একটু। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ নয়?"

"হ্যাঁ।"

ফুলু বললে—"যদি কেউ খুঁজতে আসে বোলো আমরা রামধনের বাড়িতে গেছি।"

"আচ্ছা—"

পাঁচ

রাজেনের কথা

নিরুদি দেখতে পেয়েছে কি? কথাটা বিজুদার কানে যদি তুলে দেয় তাহলেই মুশকিল হবে। লোভ সামলাতে পারলাম না কিছুতে। নাইন নাইন নাইন আজকাল তো দেখাই যায় না বাজারে, বিজুদা পেলে কোথা থেকে! বিজুদা অনেক সন্ধান রাখে। আমার বিশ্বাস ওই যে অ্যামেরিকান সাহেবটা বিজুদার কাছে আসে সেই সন্ধান দিয়েছে। আমাদের হস্টেলের কাছে যে দোকানটা আছে সেটা অতি বাজে। পছন্দমত জিনিস একটা পাওয়া যায় না। কুইংক্ রাখে না। কোবরা পালিশ নেই। যা চাও তাই বলে নেই। বিজুদা কি টের পাবে? বেশী সরাই নি, গুটি চারেক মাত্র। নিরুদি যদি দেখতে পেয়ে থাকে ঠিক বিজুদাকে বলে দেবে। দু'জনে ভাব খুব। বলবে কি? বলুক গে। মু আছে সামলে দেবে ঠিক। মু জানে আমি স্মোক্ করি। কিন্তু চুরি করেছি শুনলে চটে যাবে হয়তো। কিন্তু মুশকিল চটলে বোঝা যাবে না। হাসবে শুধু মুচকি মুচকি, তর্জনীটা তুলে শাসাবে হয়তো দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে, আর হাসবে, বোঝা যাবে না চটেছে। না বোঝা যাক সামলে দেবে তবু। আমাকে আজ খবরের কাগজটা পড়তে দিলে না কেন বুঝলাম না। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললে। খেলার খবরটা দেখাই হয়নি আজ। মোসাদেকেরই বা কি হ'ল কে জানে। কাশ্মীরের আবদাল্লা যে শেষ পর্যন্ত আলিবাবার আবদাল্লা হয়ে যাবে কে জানত। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ধরেছিলেন কিন্তু ঠিক। মু আমাকে কাগজটা

পড়তে দিলে না কেন! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে কিছু। ও, বুঝেছি! মু বাজিতে হেরেছে বোধ হয়। ঠিক হেরেছে। আমি বলেছিলাম ইস্টবেঙ্গল এবারও জিতবে, মু বলেছিল হারবে। চার পাঁচ দিন থেকে কোলকাতা ছাড়া, কোলকাতার কোন খবর পাই নি। কাল খেলাটা হয়ে গেছে। আজকের কাগজে খবরটা আছে বোধ হয়। সেইজন্যই মু দিলে না কাগজটা। নগদ দশটি টাকা গুণে দিতে হবে, আমি ছাড়ছি না। দেখতে হবে কাগজটা। কে আসছে ? ওরে বাবা, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বিজুদা!

"কে রাজু নাকি ? এখানে কি করছিস ?"

"এমনি বেড়াচ্ছি—"

"এদিকে নিরু এসেছিল, দেখেছিস তাকে ?"

"নিরুদি আর ফুলুদি এইখানেই ছিল। রামধনের বাড়িতে গেল বোধ হয়।"

"রামধনের বাড়িতে ? কেন ?"

"জানি না তো।"

"তুই গিয়ে নিরুকে পাঠিয়ে দে একবার আমার কাছে। তার সঙ্গে দরকার আছে একটু।"

"এইখানেই পাঠিয়ে দেব ?"

"আমি ওই টিলাটার উপর বসছি।"

"আচ্ছা—"

বাঁচা গেল ! নিরুদির সঙ্গে কি দরকার বিজুদার। নিশ্চয়ই নিরুদি কিছু বুঝতে চেয়েছে বিজুদার কাছে। আর একদিনও এসেছিল আমাদের বাড়িতে। এসব বোঝাবুঝির আড়ালে আর কিছু নেই তো ! ওরা সব বেরালের জাত, অন্যমনস্ক হলেই পাত থেকে মাছটি তুলে নেবে, একটু খাতির করবে না। আর বিজুদা যে রকম ভাবে-ভোলা লোক—!

ছয়

অবনীশের কথা

পায়রাগুলোর ব্যবস্থা করে' সুখেন আবার এসে বসেছিল আমার কাছে। আবার শুরু করেছিল তার গল্প। খাপছাড়া ভাবে মাঝখান থেকেই শুরু করেছিল। মৃদুলার অনুরোধে গোটাদুই কাটলেট খেয়ে পূবদিকের বারান্দার কোণে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে পড়েছিলাম, এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে আমার পায়ের উপর পড়েছিল। ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম একটু, মানে চোখ বুজে পড়ে' ছিলাম, মনে হচ্ছিল একটু যেন নেশা হয়েছে, কিসের নেশা তা বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, উপভোগ করছিলাম সেটা। একটা সূক্ষ্ম জাল, সুতোর নয়, আলোর, নানা রঙের আলোর—আমার চারিদিকে যেন মূর্ত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। আমি অস্পষ্ট ভাবে ভাববার চেষ্টা করছিলাম ঊর্ণনাভটি আমি স্বয়ং না আর কেউ। এমন সময় সুখেন হাজির হল।

"অবন ঘুমুলি নাকি—"

"না। পারাবত পর্ব শেষ হল তোমার?"

"হয়েছে। জিরে গোলমরিচটা বাটা হলেই চাঁড়িয়ে দেব এইবার। শুকুলই দেবে। আমি ততক্ষণ গল্পটা শোনাই তোকে। ছেলে-মেয়েগুলো বেরিয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। কতদূর বলেছি বলতো—"

"সেই যে কোন মেয়েকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এইখানে একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার কৃতিত্ব ওই কুড়িয়ে-পাওয়া পর্যন্ত। আর কিছু আমি করিনি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই কুড়িয়ে পাওয়াটাও আমার কৃতিত্ব কিনা সন্দেহ আছে। আমিই ওকে দেখতে পাব এইটে হয়তো আগে থাকতেই

ঠিক হয়েছিল, আর সেই জন্যেই বোধ হয় রঘু ডোমের কাছে শুয়োরের দাঁত পেলাম না, যেতে হল আমাকে তেজপুরে শিবুর কাছে। ভাগ্যে সেবার পুজো ছিল দেরিতে, তাই শুয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়িটি বসাতে পেরেছিলেন মামী। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট্ করছিলাম—আমাদের গ্রামের সেই বাগানটা দেখেছিস ? সেই যে বাগানটায় কহিতুর আমের গাছ ছিল একটা, তোকে খাইয়েছি তো সে আম, মনে নেই ? এত ভুলে যাস্ তুই ?”

হঠাৎ আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে সুখেন।

‘‘আমের কথা মনে আছে। শুয়োরের দাঁতের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না”

‘‘পারবে কি করে’। শহরে শহরে কাটিয়েছ চিরটাকাল, লক্ষ্মীপুজোর ব্যাপার খুঁটিয়ে জান না। জানলে বুঝতে।”

“ও, লক্ষ্মীপুজোয় শুয়োরের দাঁত লাগে বুঝি—”

‘‘হ্যাঁ। বেড়ের মাঝখানে দিতে হয় ! তার উপর বসাতে হয় ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি। আমার কি মনে হয় জানিস্ ? আমাদের পুজোগুলোর মধ্যে মানব-সভ্যতার, আজকালকার ভাষায় প্রগতির, ইতিহাস লুকোনো আছে। শুয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি বসানো মানে শত্রুকে জয় করে লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করা। ওটা ছেলেখেলাও নয়, ননসেন্সও নয়। লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে পশুকে জয় করা চাই, ওটা, মানে শুয়োরের দাঁতটা হল আমাদের সেই পশু-জয়ের প্রতীক। এটা আমার থিয়োরি অবশ্য, মানা না-মানা তোমার ইচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম বাগানের ভিতর দিয়ে যখন শর্টকাট্ করছিলাম, তখন প্রথম চোখ দুটো দেখতে পাই। ছোট ছোট দুটো পূর্ণিমার চাঁদ, বা এক জোড়া দামী বৈদূর্যমণি, এখন নানারকম উপমা

দিতে পারি, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল বন-বেরালের চোখ, অন্ধকারে জ্বলছে। লক্ষ্মী-প্যাঁচা বলে বুঝতেই পারি নি তখন, এক ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম তখন, ভয়ে। কিন্তু আমার স্বভাব তো জানিসই, কোন জিনিসকে তলিয়ে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাই না। তলিয়ে দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা ঘটে গেল। কিন্তু তারপর আমার আর কোন হাত নেই। মামা মামী দুজনেই কিন্তু সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মামীর মতে আমি যদি ওই কুড়োনো মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়েই বলতাম—নিজে বরাবর ওকে 'কুড়ুনী' বলেই ডাকতেন তিনি—তাহলে ব্যাপারটা এমন জট পাকাত না। জট পাকিয়ে গেছেন অবশ্য তিনিই বেশি, তিনি মুখে বলতেন কুড়ুনী, কিন্তু মনে মনে জানতেন অন্যরকম। বাইরে বকতেন, মারতেন, মুখে চব্বিশ-ঘণ্টা দাঁতে চিবিয়ে রাখতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় করতেন, ভক্তি করতেন। আমি একদিন স্বচক্ষে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। অদ্ভুত—"

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু। আমার চারিদিকে, মানে আমার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে, যে জালটা ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করছিল সেটাও যেন থেমে গেল। সেটাও যেন কথা কইছিল আমার কানে কানে সূক্ষ্ম বর্ণের ভাষায়। চেয়ে দেখলাম সুখেন্দু দিগ্বলয়ের দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে আছে। সেখানে ময়ূরপঙ্খী নেই, একটা ছোট শাদা মেঘ, খুব ছোট, একা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে-ও যেন মহাশূন্যের জ্যোৎস্নালোকিত মহিমায় অদ্ভুত কিছুর সন্ধান করছে। বড় ছিল, ছোট হয়ে গেছে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

"কি দেখলুম জানিস্?"—সুখেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু করল আবার—"দেখলুম সেই কুড়ুনী মেয়েটাকে, যাকে তিনি সমস্ত দিন খাটাতেন, বাসন মাজাতেন, ঘর ঝাড়ু দেওয়াতেন, কাপড় কাচাতেন, অষ্টপ্রহর যাকে দূর

দূর করতেন, মর মর করতেন, সেই মেয়েটাকে প্রণাম করছেন গলবস্ত্র হয়ে। গভীর রাত, ছম ছম করছে চারিদিক, মিট মিট করছে ঘরের প্রদীপ, মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে তার গালে কপালে, আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার ধারে চোরের মতো। মামী বসে আছেন মেজেতে হাতজোড় করে, হাঁটু গেড়ে। প্রণাম করছেন বারবার। ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত একটা হাসি, মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার মতো। আমি চোরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি নির্বাক হয়ে। অদ্ভুত সত্যিই অদ্ভুত। অথচ ওই মানুষই দিনের বেলায় কি কান্ডই করতেন, যেন ওই কুড়োনো মেয়েটা আপদ বালাই, দূর হয়ে গেলে যেন হাড় জুড়োয় ও'র। আসল কথা জানিস্? নজরে বিশ্বাস করতেন মামী। ধরতে পারলি কথাটা—"

পারলাম কিনা তা ব্যক্ত করবার মুখেই বাধা পড়ল। রামধন দাঁড়াল এসে।

"পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটা চাইলেন ফুলুদিদি।"

"ফুলুদিদি কোথা?"

"আমার বাড়িতে।"

"আর কে আছে?"

"নিরুদিদি।"

"পেট্রোম্যাক্স নিয়ে কি করবে এখন?"

"কি একটা বই পড়ছেন। আমার লণ্ঠনটায় তেল নেই।"

"ও, আচ্ছা নিয়ে যাও। দাঁড়াও জেবলেই দিই আমি। সেবার জবালতে গিয়ে ম্যানটেলটি ভেঙেছিল রাজু।"

উঠে গেল সুখেন। আবার তন্দ্রা এল। তন্দ্রায় মনের ভিতরে ঝড় বইতে লাগল। আঁধি। ধুলো উড়তে লাগল। মনের ভিতর কতদিনের কত আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছিল, সব উড়তে লাগল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বরাহ শিকারীর

দল কলরব করতে লাগল একযোগে। মনে হল ঝড়ের ওপারে ডাইনীর দল বসে' আছে বিষাক্ত দৃষ্টির ফাঁদ পেতে সত্য-শিব-সুন্দকে ধরবে বলে', মারবে বলে'। সত্য-শিব-সুন্দর কুৎসিতের বেশ ধরেছে, মুখোশ পরে পার হয়ে যাচ্ছে ফাঁদ, এড়িয়ে যাচ্ছে ডাইনিকে। ভণ্ডামির নৌকোয় পার হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দর...ঝড়ে নৌকো ডুবে গেল...অপার সমুদ্রে ভাসছে সত্য-শিব-সুন্দর...ঝড় প্রবলতর হচ্ছে... ঢেউগুলো উত্তাল...তারপর কেবল ঝড় ঝড় ঝড়। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরেও ঝড় উঠেছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলাম। সুখেন পেট্রোম্যাক্স জেবলেছে। জানালা দিয়ে প্রখর আলো পড়েছে এক ঝলক বারান্দায়। জ্যোৎস্না পালিয়েছে।

মৃদুলার গলা পেলাম।

''কার গল্প শোনাচ্ছ তুমি অবনীশবাবুকে—''

"ও একটা ভুতুড়ে গল্প। কফি করতে বললাম যে, তার কি হল?"

''হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

রামধন পেট্রোম্যাক্স নিয়ে চলে গেল। জ্যোৎস্না ফিরে এল আবার। তারপর একটা চাকর এসে তেপায়া রেখে গেল একটা আমার সামনে। তারপর কফি নিয়ে এল এক পেয়ালা। মৃদুলা নয়, চাকরটা। তারপর সুখেন এল আবার। হাতে কফির কাপ।

"কফিটা বড্ড কড়া হয়েছে।"

''কড়া কফিই ভাল লাগে আমার।"

''আশ্চর্য, মৃদুলাও ঠিক ওই কথা বললে। নিরুর কাছে খবর পেয়েছে বোধ হয়—''

নীরবে কফি পান শেষ করলাম দুজনে।

কাপটা সন্তর্পণে এককোণে রেখে সুখেন্দু জিগ্যেস করলে, "নজরে বিশ্বাস করিস তুই—?"

"করি বোধ হয়। একবার ভাল একটা বুল টেরিয়ার পুষেছিলাম, সবাই নজর দিত কুকুরটার উপর, মরে গেল সেটা হঠাৎ একদিন।"

"মামীমাও করতেন, তাই ওই মেয়েটা যে কে তা বুঝতে দিতে চাইতেন না কাউকে। এমন কি মেয়েটাকেও না। কিন্তু সেদিন ওর ঘুমন্ত মুখে হাসিটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা জানে, তাকে মামী ফাঁকি দিতে পারেন নি"

ঠিক এই সময় সেই গন্ধটা পেলাম আবার। চেনা অথচ অচেনা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলা আমার পিছনদিকের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সোজা মাঠের মধ্যে নেবে গেল।

"তুই আবার কোথা চল্‌লি। রামধনের বাড়িতে নাকি?"

"না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

ঘাড় ফিরিয়ে কথাগুলি বলে' মৃদুলা চলতেই লাগল কিন্তু। থামল গিয়ে, হাতাটা শেষ হয়েছে যেখানে সেইখানে। থেমে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে। যেন কারো অপেক্ষা করছে। সুখেন বোধ হয় আবার গল্পটাই শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু থামের আড়াল থেকে শুকুল ঠাকুর গলা খাঁকারি দিলে সন্তর্পণে।

"কি শুকুল? পায়রাটা চড়িয়ে দিয়েছ?"

"দিয়েছি। এখনি হয়ে যাবে। কিন্তু খাওয়া হবে কিসে?"

"কেন অত কলাগাছ রয়েছে, পাতা কাটতে বল ভজুয়াকে।"

"ভজুয়া কাটাতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদি মানা করলে।"

"দিদি মানে মৃ?"

"হ্যাঁ—"

"ও আচ্ছা থাক, কেটো না তাহলে। মৃকে জিগ্যেস করছি আমি—"।

শুকুল চলে গেল। আমরা দুজনে মৃদুলার দিকে চাইলাম। আমার মনে হতে লাগল, জ্যোৎস্না, কুয়াশা, আর আমার চোখের ভুল মিলে যে জিনিসটা মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতার ওপারে, তা মৃদুলা নয়, তা আর ফিরবেও না। যে ফিরে এসে আমরা কিসে খাব তার সমাধান করবে সে মৃদুলা হয় তো, হয় তো কেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে নিয়ে মন মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। সুখেনের কপালের চামড়া কুঁচকে ছিল কিনা তা আবছা আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ওর চোখ দুটোতে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা অবর্ণনীয়, মাদাম ক্যুরি প্রথম যখন তাঁর আবিষ্কৃত রেডিয়মের দিকে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতেও এই রকম একটা ভাব ফুটেছিল সম্ভবত। কয়েক সেকেন্ড নির্নিমেষে চেয়ে রইল সুখেন। তারপর আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে হাত দুটো ওলটালে।

"কিছু একটা মতলব আছে ওর। আমি আর মাথা ঘামাব না তাহলে, ও যখন ঘামাচ্ছে আমার ঘামিয়ে লাভ নেই। গল্পটাই আরম্ভ করা যাক বরং—"

"তাই কর"

"সেই কুড়োনো-মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়ে না ভেবে আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম এবং সেটা মামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম; এতেই মামী প্রকাশ্যে চটেছিলেন আমার উপর এবং মেয়েটা যে সত্যিই একটা আপদ এসে জুটে গেল এ কথাটা দিবালোকে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর কি ছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি একদিন। বললাম তোকে এক্ষুণি। মেয়েটির সম্বন্ধে মামীর বাইরের অশ্রদ্ধা এবং ভিতরের শ্রদ্ধা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তাতে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন মামা। তিনি মামীর শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা দুটোরই আভাস পেতেন, ঠিক করতে পারতেন না নিজে কি করবেন। ওর সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করলেও মামী বকতেন, খারাপ ব্যবহার করলেও বকতেন, নির্বিকার থাকলে বলতেন, তুমি মানুষ না পাথর! ফলে মামা আমার উপর চটে' গেলেন, ভাবলেন আমিই এই বিপদ জুটিয়েছি। তারপর ফেল করেছিলাম সেবার, তাই মামার চোখের দৃষ্টি কটমট থেকে কটমট-তর হ'য়ে উঠত মাঝে মাঝে। পরে অবশ্য তিনিও আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, যখন ভালবেসে ফেললেন মেয়েটাকে, বুঝেছিলেন যে, লক্ষ্মী যখন আসেন শোরগোল করে' আসেন না, চুপি চুপি অলক্ষ্যে আসেন নারিকেল-ফলোম্বুবৎ, বুঝছিলেন যে, আমি নিমিত্তমাত্র, ও আসতই। তাই শেষের দিকে তাঁর চোখের দৃষ্টি আর কটমট তো ছিলই না, কোমল হয়ে এসেছিল রীতিমত, সে দৃষ্টি যেন বলত, বাবা সুখেন দীর্ঘজীবী হ' তুই। তিনি যে মেয়েটাকে ভালবেসেছিলেন তা বোঝা গেল যখন বছর চারেক পরে ওই কুড়োনো মেয়ের এক পিসেমশাই হাজির হল এসে। শুয়োরের মতো দেখতে। এসে বললে শ্রীদামগঞ্জে লক্ষ্মী পুজোর মেলা দেখতে ওর পিসীমা ওকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, মেলায় ও হারিয়ে যায়। লোকমুখে শুনলাম আপনারা নাকি মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন একটি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শুনে মামা বললেন, ও আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে গেছে, ওকে এখন আমরা ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন। পিসেমশায় বললেন, আমি ওকে নিয়েই যেতে চাই। ওর মা-বাবা মারা যাবার পর ওর পিসীই ওকে মানুষ করেছিল কিনা। এর উত্তরে মামা সংক্ষেপে বললেন, আমরা ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না, মাপ করবেন। লোকটা চলে গেল। কিন্তু গিয়ে মকোদ্দমা ঠুকে দিলে একটা মামার নামে। উকিল ভজহরি সেন সব শুনে মাথায় হাত বুলুলে কয়েকবার চোখ বুজে, তারপরে বললে, আমরা জিতব। কিন্তু লড়তে হবে, টাকা খরচ হবে। মামার

তখন হাত খালি। দোকানটি ফেল মেরেছে। কুড়োনো-মেয়েকে নিয়ে মকোদ্দমা বেধেছে শুনে মামী তো ক্ষেপে গেলেন। মেয়েটাকে দিনের বেলা এমনভাবে দাঁতে চিবোতেন যেন কাটোয়ার ডাঁটা চিবুচ্ছেন, আর রাতের বেলা হাত জোড় করে প্রণাম করতেন। আমি মজা দেখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে। ভজহরির মতি বদলে গেল হঠাৎ। বললে কুছ পরোয়া নেই, ফি দিতে হবে না আমাকে, আমি এমনিই খাটব। খাটতে লাগলেন। আমার বয়স তখন বছর চোদ্দ কি পনের। ভজহরি একটা ঠিকানা দিয়ে আমাকে বললেন, একটি কাজ করতে হবে বাবা তোমাকে। তুমি এই ঠিকানায় চলে যাও, চলে গিয়ে মেয়েটির মা বাপের নাম আর ওদের কুল পরিচয় সংগ্রহ করে' আন। পিসে-মশায়ের খবরও যদি কিছু পাও নিয়ে এস সংগ্রহ করে'। গেলাম। তখনই জানলাম যে মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। মহাদেব মুকুজ্যে ওর বাপের নাম। মহাদেব মুকুজ্যে আর তার বউ শৈলবালা একদিনে একসঙ্গে কলেরায় মারা গেল যখন, পিসেমশায় বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর ঘাড়ে মেয়েটা তখন পড়ে' গেল। বছরখানেক বয়স তখন ওর। বটুকে-শ্বরের স্ত্রী ছিল না, ছিল একটি রক্ষিতা। শুনলাম দুজনে মিলে মদ খেত, আর ঠ্যাঙাতো ওই কচি মেয়েটাকে। জুতো পেটা করত শুনলাম। শ্রীদামগঞ্জের মেলায় ওকে এনেছিল বিক্রি করবার জন্যে। তারিণী বাগদীর বাঁজা বউ-(নবিগঞ্জে বাড়ি তাদের, মাইলখানেক দূরে) কিনতে চেয়েছিল মেয়েটাকে নগদ কুড়ি টাকা দিয়ে। পাড়ার লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শ্রীদামগঞ্জের মেলায় বেচা-কেনা হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু মেলার ভিড়ে মেয়েটা গেল হারিয়ে। হঠাৎ উবে গেল যেন, আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। যে মেয়েকে বটুক অমন করে' বাড়ি থেকে বিদেয় করতে চাইছিল তাকেই ফিরে পাওয়ার জন্যে আবার মকোদ্দমা

করছে কেন, এ রহস্যের সমাধান করে' এলাম আমি। মেয়েটাকে বিদেয় করে' দেওয়ার পর থেকে হাড়ির হাল শুরু হয়েছিল বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর। কাত্যায়ণীর, মানে সেই রক্ষিতাটির, কুষ্ঠ হল, দেনার দায়ে জমিগুলা নীলামে উঠল, লিবারে ব্যথা হতে লাগল বটুকের, ডাক্তাররা পয়সা লুটতে লাগল। এমন সময় এল পাঞ্জাবী গনৎকার। সে বটুকেশ্বরের হাত দেখে বললে—তোমার ঘরে লক্ষ্মী এসেছিলেন, তুমি জুতো মেরে তাঁকে বিদেয় করেছ, তাই তোমার এই দুর্দশা। তুমি আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তাহলেই লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে তোমার। বটুকেশ্বর তাই খুঁজে খুঁজে এসেছিল। সমস্ত শুনে উকিল ভজহরি সেন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবাস। পাঠালেন তখন নিজের মুহুরি সনাতন ভটচাজকে। সনাতন সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে একেবারে পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করে' এল। ভজহরি খুঁজেপেতে মহাদেব মুকুজ্যের সঙ্গে আমার মামার এক সম্পর্ক বার করলেন, একটা জাল চিঠিও তৈরি করলেন। সে চিঠিতে লেখা ছিল যে তাঁদের অবর্তমানে মামা যদি মেয়েটির ভার নেন তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কারণ ডাক্তার বলছে যে তাঁদের আর বাঁচবার আশা নেই। চিঠিটা এমনভাবে লেখা ছিল যেন মহাদেব মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে শুয়ে চিঠিটা লিখিয়েছিলেন শ্যামলাল মিত্তিরকে দিয়ে। মাত্র পঁচিশ টাকা নিয়ে শ্যাম-লাল আদালতে এসে এই মিথ্যে কথাটি বলে গেল। তারিণী বাগদির বাঁজা বউও এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে গেল। সত্য কথাটা বলবার জন্যে অবশ্য টাকা দিতে হল তাকে। মকোদ্দমায় জিতলেন ভজহরি। বটুকেশ্বর গলায় দড়ি দিলেন, কাত্যায়ণী আশ্রয় নিলেন এক কুষ্ঠাশ্রমে। শুনেছি এখনও বেঁচে আছেন তিনি। শুয়োর বধ হল, তারপর তার দাঁতের উপর লক্ষ্মীও এসে বসলেন। শুয়োরের

দাঁতের অনেক মান রে ভাই, চট করে' ওসব জিনিস উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু বটুকেশ্বর নয়, আর একটা শুয়োরও শায়েস্তা হ'ল। আমাদের পূর্ণ পুরুত। আজকাল একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে, কোমর সোজা করতে পারে না আর। সে দিনরাত মামীর কানের কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—কোথা থেকে একটা কুড়োনো মেয়েকে নিয়ে মাখামাখি করছেন আপনারা, কি জাত তার ঠিক নেই...। মামী তার কথায় সায় দিতেন ঝঙ্কার দিয়ে। বলতেন, বলুন গিয়ে সুখেনকে আর তার মামাকে। কোথা থেকে এক আপদ জুটিয়ে হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমার। পূর্ণ পুরুত আমাকে বলেছিলেন একদিন, তোমাদের এ অনাচার কিন্তু সমাজ সহ্য করবে না, তোমার মামাকে বোলো আমি বললুম, আপনিই বলুন না মামাকে। সে সাহস কিন্তু পূর্ণ পুরুতের ছিল না। মামীর কাছে গিয়ে গুঁইগাঁই করত কেবল। মকোদ্দমায় মেয়েটার পিতৃ-পরিচয় যখন জানা গেল, তখন পূর্ণও শায়েস্তা হল। তারপর থেকেই ঘুণ ধরল ওর মেরুদণ্ডে। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু।

"তারপর?"

"চুপ কর। মৃ আসছে, ও চলে যাক, তারপর বলছি—"

দেখলাম মৃদুলা ফিরছে।

কাছে আসতেই সুখেন বলল, "পাতা কাটতে মানা করে' গেছিস্ তুই—"

"হ্যাঁ, মর্তমান আর অগ্নীশ্বর ছাড়া অন্য কলার গাছ এখানে কোথায়। ওসব গাছের পাতা কেটে নিলে কি আর বাঁচবে ওরা—"

"খাব কিসে আমরা তাহলে।"

"সে ব্যবস্থা করেছি। বাসন আসছে—"

"এখানে বাসন পেলি কোথা—"

"সে পরে বলব।"

আমার দিকে চট করে একবার চেয়ে সুখেনের দিকে চাইলে মৃদুলা। মুখে হাসি, চোখেও হাসি।

"কই বাসন—"

"ওই যে আসছে।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জনচারেক ষণ্ডা লোক মাথায় করে' কি বয়ে আনছে। মনে হল চারটে দৈত্য যেন।

"কি বাসন আনছে ওরা।"

"কাচের প্লেট। কার্পেটের আসনও আছে।"

মৃদুলা ভিতরের দিকে চলে গেল।

"কাণ্ড দেখ"—

সুখেনও অনুসরণ করল তার।

আমি বসে রইলাম চুপ করে। আমার মনে হতে লাগল সুখেন্দু আমাকে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্প বলবে বলেছিল। এতক্ষণ ধরে' ও যা বলল তাতে জ্যোৎস্নার কথা বিশেষ ছিল না, কিন্তু আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। খোলাখুলি মুক্ত আকাশে যে জ্যোৎস্না দিগদিগন্তকে উদ্ভাসিত করে' তোলে সে জ্যোৎস্না নয়, যে জ্যোৎস্না গভীর অরণ্যে শাখা-পল্লবের ফাঁক দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো দেখা যায় সেই জ্যোৎস্না। একবার জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিরাট একটা বটগাছের তলায় শুয়ে এই রকম জ্যোৎস্না দেখেছিলাম মনে পড়েছে। আকাশের বুকে আলো আর কালোর জাফরি টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন সুখেন্দুর এলোমেলো গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সেইরকম জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। সুখেন্দু হয়তো জানেনা যে আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার গল্পটা ফলাও করে বলবে হয়তো সে এইবার। কিম্বা কে জানে হয়তো বলবেই না। আমার মন কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পই শুনছিল।

সাত

নিরুর কথা

রামধনের বউ শুয়ে আছে চুপ করে। অপরাধীর মত শুয়ে আছে, তার চোখে মুখে কি কুণ্ঠিত সঙ্কোচ যে ফুটে উঠেছে আমরা বসে আছি অথচ তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে এর অপরিসীম লজ্জা যেন ঢাকতে পারছে না বেচারা আর কিছুতে। উঠে বসেছিল আমরা আসাতে, উঠে বসেছিল এত জ্বর নিয়েও। কিছুতেই শুচ্ছিল না. ফুলু ধমক দেওয়াতে শেষকালে শুয়ে পড়ল। মনিবের ধমকে পোষা কুকুর শুয়ে পড়ে যেমন করে। ফুলুর বাবা ওদের অন্নদাতা, ফুলুর কথা কি অমান্য করতে পারে ও ? লণ্ঠনে তেল ছিল না, তা-ও যেন ওরই অপরাধ। রামধন এমন খেঁকিয়ে উঠল ওকে। তারপর ছুটে গেল, নিয়ে এল পেট্রোম্যাক্স। বড়-লোকের মেয়ে শখ হয়েছে পিকনিক করতে এসে রাতদুপুরে উলের সোয়েটার বুনবে, এর বিরুদ্ধে কি কথা বলা চলে কারও। মেয়েটা কিন্তু অত্যন্ত হাঁদা। নিজে হাতে করে' দেখিয়ে দিলাম খানিকটা, বুঝিয়ে দিলাম. তবু বইটা খুলে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে পাতার দিকে।

"নিরুদি, বই পড়ে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পড়ব ?"

"পড়।"

"১ সোজা, ১ সোজা, সামনে সুতা ২ সোজা ৩ উল্টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্টা-জোড়া, ৩ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সুতা, পুনরাবৃত্তি কর। সর্বশেষে ৩ সোজা। এতো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"

"এখন ছেড়ে দাও। পরে কোরো—"

"না, আজ আমাকে খানিকটা করতেই হবে।"

একটা হাস্যকর জেদ ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। রামধনের বউ একবার আমার দিকে একবার ফুলুর দিকে চাইল। জ্বর খুব বেড়েছে বোধ হয়। মুখের ফেকাশে রংও লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের দিকে চেয়ে ও যেন তৃপ্তি পাচ্ছে, মুখের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে সেটা। একটা ছেলেমানুষি আনন্দও যেন জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটোতে। আমরা যে এসেছি, বসেছি ওর ঘরে, এতেই যেন ও কৃতার্থ, আমাদের এই উল-বোনা নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রতি কথাটি ও যেন উপভোগ করছে, আমরা যেন থিয়েটার করছি আর ও যেন দেখছে সেটা, অনায়াসে, বিনা পয়সায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু সঙ্কোচ ওর যেন ঘুচছে না, অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

"দাও না লক্ষ্মীটি—"

রামধনের বউ আবার চাইলে আমার মুখের দিকে। এবার লক্ষ্য করলাম তার দৃষ্টিতে তিরস্কারও আভাসিত হয়েছে। উঠতে হল।

"আমি নিজেই করে দিই খানিকটা, তাড়াতাড়ি হবে"

"না। আমি মিছে কথা বলতে পারব না। আমি নিজে করব।"

আশ্চর্য জেদী মেয়ে। কাকে মিছে কথা বলতে পারবে না? কেমন যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে কথাগুলো।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

বোঝাতে শুরু করলাম। রামধনের বউয়ের চোখমুখ হৃষ্ট হয়ে উঠল।

"নিরু কি এখানে আছ?"

বাইরে থেকে কে ডাকছে। আমাকেই ডাকছে। না-শোনার ভান করলাম। ডাক আসবে জানতাম, কিন্তু এভাবে ডেকে পাঠাবার মানে কি। না-শোনার ভান করলাম।

"তোমার কাঁটাই ত ধরা হয়নি ঠিক করে। এই রকম করে ধর।"

"কিন্তু ছবিতে—"

"ছবিতে ঠিকই আছে, এই এইরকম করে—"

''ও বুঝেছি!"

"ফুলুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। শিশুর হাসি, অকৃত্রিম, সরল।

"ঠিক হচ্ছে না?"

''হচ্ছে। উলটা অমন করে ঝুলছে কেন। সব জড়িয়ে যাবে যে। বলটা সামনে রাখ, উলের টানটা বেশ সমান থাকা চাই এমন ভাবে ধরতে হবে। বেশী জোরে ধরলে বোনা শক্ত হয়ে যাবে, বেশী ঢিলে করে ধরলে বোনাও ঢিলে হবে। হ্যাঁ, ডান হাতের কড়ে আঙগুলে একবার পাক খাইয়ে নাও, তারপর অনামিকা আর তর্জনীর নীচে দিয়ে এনে, ছবিটা দেখ না—"

"ছবি দেখে বোঝা যায় না। এই দেখ এবার হয়েছে?"

''হয়েছে। কাঁটাটা আর একটু—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে—"

ডাকটা থেমে গেল কেন? ঘাড় ফিরিয়ে দেখি রাজু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে।

কখন ঢুকেছে টের পাই নি। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, চাপা হাসি ঝিক্‌মিক্ করছে ঠোঁটের কোণে।

''বিজুদা খুঁজছে তোমাকে।''

''আমাকে?"

ভান করতে হল বিস্ময়ের। রাজুর কাছে আত্মপ্রকাশ করার মানে হয় না কোনও। কিন্তু বিজুদার কি আক্কেল,

রাজুকে পাঠিয়েছে ডাকতে।

"বিজুদা কোথায়?"

"মাঠে, টিলার উপর বসে আছে—"

ফুলু অপটু হস্তে বুনে চলেছে। সেই দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

"আমি অপেক্ষা করছি না হয়।"

"অপেক্ষা করার দরকার কি?"

"মাঠের ভিতর দিয়ে একা যাওয়া ঠিক নয় এত রাত্রে।"

"ক'টা বেজেছে?"

"তা দশটা হবে।"

রাজু হাতঘড়িটা একবার কানে দিয়ে, তারপর দম দিতে লাগল।

"ফুলুদি তোমার ঘড়িটায় কটা বেজেছে দেখতো। আমার ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছি।"

ফুলু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

"আমারটাও বন্ধ—"

ফুলুকে কি করে বলা যায় ভাবছি এমন সময় ফুলু নিজেই বললে—"তুমি ঘুরে এস নিরুদি। মনে হচ্ছে, আমি এবার পারব নিজে নিজেই। দেখ তো, হচ্ছে না?"

"বেশ হচ্ছে—"

বাইরে বেরিয়েই রাজু চুপি চুপি বললে—"আসতে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম নিরুদি।"

"কি—"

আমাদের বাংলোর হাতাটা অনেক দূর পর্যন্ত, ওই যেখানে ছোট টিলাটা রয়েছে ঠিক তার নীচেই তারের বেড়া। আসবার সময় দেখলুম কে একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে। ধপধপে শাদা কাপড়-পরা, দূরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হ'ল স্ট্যাচু, পাথরের নয়,

কুয়াশার। তারপর দেখলাম চারটে দৈত্যের মতো লোক আসছে, মনে হল যেন শূন্য থেকে এল, মানে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দেখতে পেলাম তাদের। পাথরে-কোঁদা কালো কালো চেহারা, প্রত্যেকের মাথায় বোঝা। কিসের বোঝা বুঝতে পারলাম না। তারপর খদে নাবতে হল আমায়—ওই যে খদটা আছে ওটাতে নাবলে শর্টকার্ট হয়—খদে নাবলে আর কিছু দেখা যায় না। খদ থেকে যখন উঠলাম তখন দেখি কেউ নেই—কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সব—"

"মৃদুলা দাঁড়িয়ে ছিল বোধ হয়। একটু আগে তো ট্রেন এল একটা। শহর থেকে জিনিসপত্র এল সম্ভবত কিছু—

"মৃ নয়। মৃ-কে আমি চিনতে পারব না? সে কি রকম যেন অদ্ভুত। তাছাড়া তার গা থেকে আলো বেরুচ্ছিল যেন—"

চেয়ে দেখলাম তার দিকে। মনে হল ভয় পেয়েছে।

"ভয় করছে নাকি?"

"ভয় আমার করে না। তবে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। এটা একটা কবরস্থান ছিল জান তো?"

"শুনেছি।"

মনে পড়ল আমি আর ফুলু যখন টিলাটার উপর বসে-ছিলাম তখন সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম একটা। অথচ কাছাকাছি কোনও লোক যে সিগারেট খাচ্ছিল তার প্রমাণ তো পাওয়া গেল না। রাজুকে বললাম সে কথা।

রাজু চোখ বড় বড় করে' বললে—"ওই দেখ। আমি তো কাছেই ছিলাম, কাউকে সিগারেট খেতে দেখিনি তো।"

"তুমি খাচ্ছিলে না তো?"

"আমি? না।"

আট

দ্বিজেনের কথা

নিমাই ছাতের উপরই বসেছিল। কম্পাউন্ডারের মুখে শুনলাম দুটো রোগীকে নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই বিশেষ, যা রোজকার করে তার অধিকাংশই দান করে নাকি। টাকার খাঁকতি নেই।

"আপনাকে ওপরেই আসতে বললেন।"

চাকরটা এসে খবর দিলে নীচে। তার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ারও দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে ছাতে গেলাম, চাকরটাও এল আমার পিছু পিছু। এসে নীরবে চেয়ারটা পেতে দিয়ে চলে গেল। নিমাই চুপ করে' বসেছিল। একটি কথা বললে না আমাকে দেখে। আকাশে একটা খুব বড় নক্ষত্র দপ দপ করে জ্বলছিল, তার দিকে চেয়ে চুপ করে' বসেই রইল সে। আমিই কথা বললাম প্রথমে।

"আমাদের সেই পোড়ো বাংলোয় পিকনিক হচ্ছে আজ। তোমাকে নিতে এসেছি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে নিমাই বলল, "বেশ, যাব" বলেই আবার নক্ষত্রটার দিকে চাইলে, চেয়েই রইল। আমি কথাটা কিভাবে পাড়ব ভেবে না পেয়ে সিগারেট বার করলাম, নিমাইকে একটা দিলাম, নিজেও একটা নিলাম। নিমাই সিগারেটটা নিলে, কিন্তু চেয়ে রইল আকাশের দিকে। সিগারেট লাইটারের আওয়াজ হ'ল খস করে। নিমাই তবু অন্যমনস্ক।

"নাও—"

নিমাই সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

"কি ভাবছিস তুই ?"

"ভাবছি, তুই যদি রোগী হতিস বেশ হ'ত। এক কথায় বিদেয় করে' দিতাম।"

"তুই শুনেছি প্রায়ই রোগী বিদেয় করে দিস। কেন বলতো"

"টাকার দরকার নেই।"

"তোমাকে রোগীর দরকার থাকতে পারে তো!"

"রোগীর মনে হতে পারে আমি তার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমার তো মনে হয় না। কোতলপুরের আশুও যা করে আমিও তাই করি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।"

"আশু তো কোয়াক—"

"কিন্তু সেও পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এন.এ.বি, দেয়, আমিও দিই। যেটা সারবার সারে, যেটা মরবার মরে। আমার ফি ষোল টাকা, আশুর দু টাকা। আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও।"

"তুই আজকাল ষোল টাকা ফি করেছিস নাকি?"

"তাতেও ফুরসৎ নেই। একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারকে ডেকে রোগীর আত্মীয়েরা নিজেদের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করতে চায়। আসলে চিকিৎসার চেয়ে ধুমধাম করার দিকেই অধিকাংশ লোকের বেশী ঝোঁক। আশুও খারাপ চিকিৎসা করে না। ইংরিজি মোটামুটি ভালই জানে। ইংরেজি ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞাপনগুলো আসে তা পড়ে বুঝতে পারে। ওই বিজ্ঞাপনগুলোই তো আমাদের কাছে অভ্রান্ত বেদবাক্য এখন। সে বেদবাক্যের মর্মার্থ আশুও যখন বুঝতে পারে তখন আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও। একটি মাত্র মানে হয়—আমি বিলেতের ডিগ্রিধারী।"

দেখলাম প্রসঙ্গটা যে রাস্তা ধরেছে সে রাস্তায় গেলে আমার উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাবে। ডাক্তারি নিয়ে তর্ক করতে আমি এতদূর আসি নি। সুখেনদার কথাটা এনে ফেলতে হবে কোনরকমে।

বললাম "সুখেনদা কি তোমাকে ভালবাসে তোমার ডিগ্রির জন্যে?"

নিমাই চুপ করে রইল। আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে সোজা হয়ে উঠে বসল।

"সুখেন আমাকে ভালবাসে কারণ ও জানে আমি যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারি।"

"মারা যেতে পার! তার মানে?"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই। আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল তার এই সাংঘাতিক উক্তির পর আমার ব্যক্তিগত কথা বলাটা এখন শোভন হবে কি? নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে, হঠাৎ একথা বলার মানে কি। ওর চালচলন দেখে অনেকেই আজকাল সন্দেহ করছে যে ও ক্রমশ পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমারও সন্দেহ হল। চোখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম দৃষ্টি স্বাভাবিক কিনা।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই নিমাই বললে, "তার মানে তুমি বুঝবে না। সে শক্তি তোমার নেই।"

"সুখেনদা যা বুঝতে পেরেছে তা আমিও বুঝতে পারব আশা করি।"

"আশা করতে পার কিন্তু আমি মনে করি সেটা দুরাশা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি যারা পরেছে তারা নিজের নাক পর্যন্ত দেখতে পায় না।"

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল।

বললাম, "দেখ নিমাই, হঠাৎ পণ্ডিত মশাই সেজে মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলা খুব সোজা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি প্রভৃতি কথাগুলো বড্ড একঘেয়ে হয়ে এসেছে। যদি গাল দিতেই চাও, নূতন ধরনে দাও।"

নিমাই সিগারেটটায় শেষ টান মেরে ফেলে দিলে। কোনও কথাই বললে না অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে বসল, "তুমি প্রেমে পড়েছ কখনও?"

শুয়ে শুয়েই বললে।

"তার সঙ্গে তোমার যে কোনও মুহূর্তে মারা যাওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, ভূতে বিশ্বাস কর তুমি? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলে ঠিক করব সুখেনকে যা বলেছিলাম তা তোমাকেও বলা চলে কি না।"

চাকরটা দু পেয়ালা চা নিয়ে এল।

পুলকিত হয়ে উঠলাম, চা দেখে নয়, প্রসঙ্গটার মোড় ফিরেছে দেখে। আমার প্রেমের কথাই তো ওকে বলতে এসেছি। বোতলের ছিপিটা নিমাই খুলে দিলে দেখে সত্যিই আরাম পেলাম। তবু চুপ করে' রইলাম খানিকক্ষণ। নিমাইও চুপ করে' রইল। নক্ষত্রের দিকে চেয়ে রইল।

"কি আশ্চর্য, চা-টা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

উঠে বসল নিমাই। চুমুক দিলে চায়ের পেয়ালায়। আমিও পেয়ালা তুলে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, "তুমি যখন প্রসঙ্গটা তুলেছ তখন তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। অদ্ভুত যোগাযোগের কথাটা ভেবে কেবল আশ্চর্য হচ্ছি। যে কথা তুমি তুললে সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। শুধু বলতে নয়, চাইতে। যে অদৃশ্য অফুরন্ত ডিনামাইটের অধীশ্বর তুমি সেই ডিনামাইট ভিক্ষা করতেই এসেছি আজ বিশেষ করে। মনে হল এমন পূর্ণিমা-রাত্রে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা নেই, যে ভিক্ষা দেবে সে-ও এমন রাত্রে কৃপণ হতে পারবে না—"থেমে গেলাম। মনে হল কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। নিমাই চায়ের পেয়ালাটা তুলে ঢক ঢক করে সমস্ত চা-টা খেয়ে ফেললে, মনে হল কোনও পিপাসিত মাতাল যেন মদ খাচ্ছে। একটা অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখ দুটোতে হঠাৎ। মনে হল ওর বুকের ভিতর কে যেন সুইচ টিপে আলো জেবলে

দিলে, সেই আলো ফুটে বেরুল চোখের জানলা দিয়ে। আমার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে, তারপর বললে, "এতদিনে তোমার উপর শ্রদ্ধা হল। যাকে কেউ ভালবাসে নি, কিম্বা যে কাউকে ভালবাসতে পারে নি সে মানুষ নয় শয়তান। আমার ধারণা ছিল কলিয়ারির খাদে নেবে কয়লাই ঘেঁটে বেড়াচ্ছ বুঝি, হীরের সন্ধান পেয়েছ জানতাম না। কিন্তু ডিনামাইটের হেঁয়ালিটা বুঝতে পারছি না ঠিক। ডিনামাইট দিয়ে কি ওড়াবে?"

"বাধা। যে ডিনামাইটের প্রচন্ড বিস্ফোরণে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তা তোমার কাছেই আছে. পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই, এমন কি নোবেলের উত্তরাধিকারীদের কাছেও না।"

"পরিষ্কার হচ্ছে না। আর এক পেয়ালা চা আনতে বলব? বাধাটা কিসের? ভাষাটা দুর্বোধ্য করছ কেন মিছি মিছি।"

"বাধাটা জাতিভেদের। না, ঠিক তা-ও নয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে সুখেনদার কুসংস্কারটাই আসল বাধা—"

"বেজাতের মেয়েকে ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ—"

"সুখেন কি বলছে।"

"সুখেনদাকে বলিনি এখনও কিছু। সাইড্‌কার-ওলা একটা মোটর বাইক কিনেছি খালি।"

নিমাই আবার শুয়ে পড়ল। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। মনে হল যেন নক্ষত্রটার কাছে পরামর্শ চাইছে। পরামর্শটা যাতে আমার স্বপক্ষে দেয় এই আশায় আমিও চাইলাম তার দিকে। করুণ দৃষ্টি মেলেই চাইলাম। মনে হল নক্ষত্রটা চোখ মিট মিট করে' ভরসা দিলে আমাকে।

"বিয়ে করতে চাও?"

নিমাইয়ের প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাল যদিও, যদিও মনে

হল এই নক্ষত্র-চাঁদের পরিবেশে বিবাহটা নিতান্তই বেমানান, তবু সত্য কথাটাই বলতে হল। মনে পড়ল বিয়ে করতে চাই বলেই সুখেনদার অনুমতি প্রয়োজন আর সুখেনদার অনুমতি নিমাইয়ের সাহায্য ছাড়া পাওয়া শক্ত বলেই নিমাইয়ের শরণাপন্ন হয়েছি।

বললাম, "বিয়ে করতে চাই নিশ্চয়। প্রিয়ার গায়ে পতিতার লেবেল লাগাবার আমার ইচ্ছে নেই।"

"প্রিয়াকে যদি দূর থেকে ভালবাসতে পার তাহলে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগবে কেন? বিয়ে করলে তাকে পতিতার দুর্নাম থেকে বাঁচাতে পার কিন্তু পতন থেকে বাঁচাতে পারবে না। বিয়ে করলেই প্রিয়ার পতন এবং মৃত্যু।"

"একটা বাজে কথা বললে তুমি। শারীরিক সান্নিধ্য না হলে প্রেম সার্থক হয় না। প্লেটনিক প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। তাতে কেবল পুরুষের হয় "প্লে" আর নারীর হয় টনিক এবং 'পেন্‌ফুল' টনিক।"

"আমি করি।"

নিমাইয়ের চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠল—"আমি যাকে ভালবাসি সে কোথায় আছে জানো?"

"কোথায়?"

"হ্যাঁ ওইখানে।"

নক্ষত্রটাকে দেখালে। আমি তার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

"ওইখানে?"

"হ্যাঁ ওইখানে।"

আবার তার চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু পাগলের কোন লক্ষণ চোখে পড়ল ন। বরং মনে হল আকাশের নক্ষত্রটাই যেন ছোট ছোট হয়ে নেবে এসেছে তার

চোখের তারা দুটিতে, মিট মিট করে' হাসছে। বেশ অর্থপূর্ণ সে হাসি, পাগলের হাসি নয়। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

"একটু খুলে বল, বুঝতে পাচ্ছি না—"

"খুলে বললেও বুঝবে না, যদি না বিশ্বাস কর। সুখেন বুঝেছে, কারণ তার বিশ্বাসী মন। সে জানে যে মুহূর্তে ঐ নক্ষত্র আমাকে ডাক দেবে আমি চলে যাব। এই বিশ্বাস তার হয়েছে বলে তাকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, সে আমাকে দুঃখ দিতে চায় না, পারে না, আমার কোনও অনুরোধ কখনও অগ্রাহ্য করে না। সে বুঝেছে, কিন্তু তুমি বুঝবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। তোমরা যুক্তিবাদী কি না।"

উঠে বসল নিমাই। আর একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়াটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর খানিকক্ষণ জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে।

তারপর বলল, "আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর দাওনি তুমি। ভূতে বিশ্বাস কর?"

"অবিশ্বাস করবার মতো যুক্তি আমার নেই। বিশ্বাস করবার মতোও নেই। তবে একটা কথা মনে হয়। বহুকাল থেকে বহুলোক ভূতে বিশ্বাস করেছে তাই মনে হয় ওর মধ্যে সত্য কিছু আছে—"

"নিশ্চয়ই আছে। স্বচক্ষে দেখেছি—"

"কি রকম।"

"ক'টা বেজেছে আগে জানা দরকার। সুখেন হয়তো ছটফট করছে। তোমার হাতে ঘড়ি দেখছি না।"

"না, নেই।"

ঘড়িটা বাঁধা দিয়ে যে একখানা ভাল শাড়ি কিনেছি তা নিমাইকে বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

"জটু, জটু—"

ডাকবামাত্রই নিমাইয়ের চাকরটি হাজির হল। যেন ওৎ পেতে বসেছিল।

"আমার ব্যাগটা আন তো—"

প্রকাণ্ড ব্যাগ নিয়ে এল জটু। নিমাই তার ভেতর থেকে ছোট একটি 'টাইমপিস' বার ক'রে দেখলে। নিমাই হাতঘড়ি বা পকেটঘড়ি ব্যবহার করে না।

"সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। চল, ওখানে গিয়েই বলব। সুখেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণ।"

"আজই কিন্তু সুখেনদার কাছে কথাটা পেড়ো। বুঝলে।"

"নিশ্চয় পাড়ব। আমি যে কষ্টভোগ করছি, তা আর কেউ ভোগ করুক এ আমি চাই না। তোমাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু সাবধানও করে দিচ্ছি, যে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ কোন ফায়ার-ব্রিগেড তা নেবাতে পারবে না। তুমি নেবাতে দেবে না। আর একটা কথাও মনে রেখ, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, দাহ্যবস্তু মাত্রকেই সে পোড়ায়, তুমি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আর একজনকে পোড়াবে সে। তোমার ভস্ম যদি তখন আর্তনাদও করে তোমার দিকে সে ফিরে তাকাবে না আর।"

"অসতীদের কথা বলছ—?"

"সতী বা অসতীর প্রশ্ন নয়; আমি চিরন্তনী নারীর কথা বলছি। তারা সতী হতে পারে, অসতী হতে পারে, ধনী হতে পারে, গরীব হতে পারে, সধবা, বিধবা, কুমারী হতে পারে, সামাজিক যে কোনও টিকিট তার গায়ে লাগানো থাকতে পারে—কিন্তু তার নারীত্ব কখনও ঘোচে না। একাধিক পুরুষের ডাকে সে সাড়া দেবেই কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। পুরুষের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্যে সে সর্বদা উন্মুখ। কোথায় যেন পড়েছিলাম—The heart

of a woman is never so full of affection that there does not remain a little corner for flattery and love—"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই, তারাটাকে দেখতে লাগল নিনিমেষে।

"এই তোমার অভিজ্ঞতা?"

"আমার অভিজ্ঞতা আরও ভয়ঙ্কর। পরে শুন, এখন ওঠা যাক চল।"

"যাকে তুমি ভালবাসতে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে?"

"গেছে। তবু তাকে ভালবাসি। তার জন্যে না করতে পারি এমন কাজ নেই।"

"কোথায় গেছে, কারও সঙ্গে গেছে?"

"লম্বা কাহিনী, পরে বলব। তুমি যাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করেছ সে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী তো?"

"ফুলুকে তুমি ত দেখেছ?"

"ও ফুলু। শ্রীদাম সিঙ্গির মেয়ে?"

"হ্যাঁ। স্বাস্থ্যের কথা জিগ্যেস করছ যে হঠাৎ।"

"আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে ছিল রুগ্ন। সে যদি রুগ্ন না হতো হয়তো তাকে আমি পেতাম—"

"ও।"

আর একবার নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে নিমাই বললে—"চল। আর দেরি করা ঠিক নয়।"

ছাত থেকে নেবে পড়লাম দু'জনে।

নয়

বিজেনের কথা

নিরু আসছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কি মেজাজে আসছে কে জানে। তবে যে মেজাজেই আসুক আমার কাছে লুকোতে পারবে না সেটা। নিরুর মুখের ভাব যেমনই থাকুক তার মনের ভাবটা আমি টের পেয়ে যাই। ও যখন খুব রাগের ভান করে' মুখে মেঘ ঘনিয়ে তুলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে তখন আমি বুঝতে পারি ও ভান করছে। আমিও ভান করি ভয় পেয়েছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ওর পিছু পিছু রাজু আসছে বোধহয়। রাজুটা সিগারেট খেতে শিখেছে আজকাল। আমার টিন থেকে চার পাঁচটা সিগারেট ও-ই সরিয়েছে সম্ভবত একটু আগে। মুখের ভাবটা তাই অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, ও যদিও নিজে বুঝতে পারছে না সেটা। সিগারেট সরাক, আপত্তি নেই তাতে, খুশিই হয়েছি বরং। আমাকে শ্রদ্ধা করে বলেই লুকিয়ে নিয়েছে, আর ভাল জিনিসের সমঝদার বলেই এই সিগারেট নিয়েছে। এ সিগারেট আজকাল দুষ্প্রাপ্য। সুখেনদা ওকে যে পরিমাণ টাকা দেয় শুনেছি, তাতে সিগারেট কেনবার মতো পয়সা ওর পকেটে যথেষ্ট থাকা উচিত। আমার টিন থেকে সিগারেট সরিয়েছে, খুশিই হয়েছি তাতে, খুব খুশি হয়েছি। আজকালকার ছোকরাদের মতো গুরুজনদের প্রতি ওর অশ্রদ্ধা নেই, রুচিটাও ওর মার্জিত। খুব খুশি হয়েছি। অবাক করে দিয়েছিল সেদিন। ওর এ রকম অঙ্কে মাথা, জানতাম না। চট করে ক্যালকুলাসের দুরূহ অঙ্কটা কষে

দিলে। নিরুর মুখে যেন একটা প্রসন্ন হাসির ঝলক দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ও চটেছে।

"আমাকে ডাকছ তুমি বিজুদা?"

"হ্যাঁ, একটু দরকার আছে। মানে সেই দরকারটা, তুমি এখানে আসবে জানলে ব্র্যাডলের বইখানাই নিয়ে আসতাম—লাইব্রেরি থেকে এনেই রেখেছি আমি তোমার জন্যে।"

"ব্র্যাডলে পেয়েছি আমি ফুলুর দাদার কাছ থেকে।"

"ও—"

বুঝলাম রাজু থাকলে সুবিধে হবে না। নিরু ছদ্ম হাসির তলায় চটতে থাকবে ক্রমশ, জ্যোৎস্নাটা মাঠে মারা যাবে। আমিতো যাবই।

"রাজু তুই একটা কাজ কর না ভাই। দক্ষিণ দিকের ঘরটায় জামা খুলতে গিয়ে আমার সিগারেটের টিনটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আট দশটা সিগারেট বোধহয় পড়ে' গেছে টিন থেকে। অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না, টর্চ নিয়ে একটু খুঁজে দেখতো যদি পাস। দেখিস সুখেনদা যেন টের না পায়।"

"খুঁজে পেলে নিয়ে আসব এখানে?"

"না, টিনটা ওই ঘরেই আলমারির পিছনের তাকটায় আছে। তারই ভিতরে রেখে দিস। আমার কাছে সিগারেট আছে এখন।"

রাজুর মুখের প্রচ্ছন্ন আনন্দটা উপভোগ করলাম।

"যেতে ভয় করবে না তো—!"

নিরু জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে রাজু মুচকি হাসলে একটু।

"দাদা যদি আমার খোঁজ করে আমি এখানে আছি বলে দিও।"

"সুখেনদা তোমার দাদার কাছে যে রকম গল্প

ফেঁদেছেন তাতে তাঁর অন্য দিকে মন দেওয়াই শক্ত এখন।”

“আচ্ছা বলে’ দেব।”

যেতে যেতে রাজু ঘাড় ফিরিয়ে বলে’ গেল।

রাজু কিছুদূর যেতেই নিরুর মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূভঙ্গি করে বললে, “আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন—!”

ভ্রূভঙ্গি দেখেই বুঝলাম রাগটা কমে আসছে, খুশি হয়ে উঠছে ক্রমশ।

“এই এমনি গল্প করতে। যদি ইচ্ছে কর যে প্রসঙ্গ চিঠিতে লিখেছিলে তার সম্বন্ধে আলোচনাও করতে পারি। জ্যোৎস্না রাত্রে ফাঁকা মাঠে চমৎকার জমবে।”

“আমার আর বোঝবার দরকার নেই। ফুলুর দাদা আমাকে ভাল নোট দেবেন বলেছেন একটা।”

“ফুলুর দাদার সঙ্গে আলাপ হল কোথা?”

“ফুলুদের বাড়িতেই। চমৎকার মানুষ। সত্যি চমৎকার” নিরুর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যেন ফুলুর দাদাকে দেখে ও সত্যিই মুগ্ধ হ’য়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মুগ্ধ হয়নি, আমাকে ঈর্ষাতুর করে’ তোলবার চেষ্টা করছে। ঈর্ষাই প্রকাশ করলাম সোজাসুজি।

বললাম, “তোমার রুচির উপর শ্রদ্ধা ছিল আমার। কিন্তু ফুলুর দাদাকে যদি তোমার চমৎকার লেগে থাকে, তাহলে নিজের ভুল ধারণাটা সংশোধন করতে হবে।”

“করতে পার। চারখানা চিঠি সত্ত্বেও উত্তর দেয় না যে লোক তার ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় নেই আমার!”

“আচ্ছা নিরু তুমি এমন অবুঝের মতো কথা বল কেন বুঝি না। চারখানা চিঠি লিখেও যখন জবাব পাওনি তখন তোমার বোঝা উচিত এর নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কারণ আছে। আমি হলে চটতাম না, চিন্তিত হতাম। ফুলুর

দাদা চমৎকার লোক কিনা সে গবেষণা না করে চলে যেতাম—"

নিরু এইবার কাৎ হল। ভুরু কুঁচকে আছে যদিও, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝছি কাৎ হয়েছে।

"কেন, কি হয়েছিল?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অভিমানের ভান করলাম। অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হল, কারণ আমার নিজের চোখের উপর বিশ্বাস নেই। হয়তো হাসছে।

"চুপ করে' আছ যে। কি হয়েছিল বল না।"

চুপ করেই রইলাম। মুখও ফিরিয়ে রইলাম।

"বলবে না?"

"বলে লাভ কি। ফুলুর দাদাকে যখন তোমার ভাল লেগেছে তখন কেন চিঠি লিখতে পারি নি তা জানাবার সার্থকতাই বা কি?"

নিরু এবার বলপ্রয়োগ করলে। দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে' নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

"বল না, কি হয়েছিল। আঃ—"

'আঃ' টা ব্যর্থতা-সূচক আক্ষেপ। আমার ঘাড়ের পেশী খুব দুর্বল নয়।

"বল না—"

কণ্ঠস্বরে কান্নার রেশ। ঘাড় ফেরাতে হল সুতরাং।

"কলমটা হারিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া জ্বরও হয়েছিল—"

"মিথ্যুক কোথাকার"

"বললাম তো বলা বৃথা। বিশ্বাস করবে না।"

"কলম হারিয়ে কলেজের কাজ চালাচ্ছ কি করে?"

"এর ওর কলম নিয়ে কিম্বা পেনসিল দিয়ে কিম্বা কলেজের দোয়াত কলমে—"

নিরুর চোখ দেখে বুঝলাম ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

"এক লাইনে এই খবরটাও আমাকে দিলে পারতে—"

"তোমাকে অমন ব্যাগার সারা চিঠি লিখতে পারি কখনও। তোমাকে পেনসিলে চিঠি লিখব। আন্-থিঙ্কেব্‌ল!"

"তোমার জ্বর হয়েছিল, সত্যি?"

"হয়েছিল। তুমি অবশ্য মিথ্যে মনে করবে। কর।"

"না, না মিথ্যে মনে করব কেন। চারখানা চিঠির জবাব না পেলে কার না রাগ হয়। তার ওপর পরীক্ষা সামনে—"

"ফুলুর দাদা সত্যিই যদি নোট দেবেন বলে' থাকেন—" নিরু হেসে ফেললে এবার।

"ওটা মিছে কথা। তবে ফুলুর দাদার কাছ থেকে ব্র্যাডলেখানা জোগাড় করেছি ফুলুর মারফত। ওর দাদার সঙ্গে আমার আলাপই হয় নি। আরও বই এনে দেবে ফুলু বলেছে।"

"তাহলে 'পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক' আর দুর্বোধ্য নেই আশা করি।"

"বুঝিয়ে দাও আমাকে—"

আবদারের সুর ধ্বনিত হ'ল কণ্ঠে। আর একটু সরে এল আমার কাছে। উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ বেসামাল হয়ে গেলাম।

"কি যে কর—"

নিরু সরে' বসল। যেন কত রাগ করেছে। তারপর দু'জনেই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। হঠাৎ নিরু বললে—"দাদাকে বলেছ?"

"বলেছি—"

"কি বললে দাদা?"

"বললে নিরুর যদি মত থাকে আমার আপত্তি কি। তবে সুখেনের মতটা জানা দরকার—"

নিরু চুপ করে' রইল কয়েক সেকেন্ড।

"সুখেনবাবু যদি আপত্তি করেন?" শুনেছি খুব এক বড়লোকের বাড়ি থেকে তোমার নাকি সম্বন্ধ এসেছে!"

বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। খবরটা আমিও শুনেছি, এও শুনেছি মেয়েটি নাকি সর্বগুণান্বিতা, তাকে বিয়ে করলে নাকি প্রকাণ্ড একটা জমিদারি যৌতুক পাব। চুপ করে রইলাম।

"চুপ করে' আছ যে—"

"কি বলব। সুখেনদা আগে আপত্তি করুক, তারপর ভাবা যাবে। অবনদা হয়তো আজই পাড়বেন কথাটা।"

"আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি।"

"কি?"

"ভাবছি আমি তোমার ক্ষতি করছি না তো?"

"কি ক্ষতি?"

"শুনেছি মেয়েটি সত্যিই ভাল। তার বাবার একমাত্র মেয়ে। একটা গোটা জমিদারিই নাকি যৌতুক দেবে। আমি গরীব, আমার রূপও নেই, তোমার তুলনায় গুণও নেই—" থেমে গেল নিরু।

"থামছ কেন বলে' যাও।"

"না, না এটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ কথা নয়।"

"আমি কি তা বলছি—"

"আমার একটা কথা শোন।"

"বল—। একটা কেন, যত কথা বলবে সব শুনব।"

"সব দিক থেকে বিচার করে' ওই মেয়েটিকে তোমার যদি সত্যিই ভাল বলে মনে হয়, আমার জন্যে তুমি বিয়ে ভেঙে দিয়ো না।"

"তারপর?"

"ওর সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবার পর আমাকে বিয়ে কোরো। তাতে আমার আপত্তি হবে না—"

"আর সে মেয়েটি যদি আপত্তি করে—"

"তার কাছে যাব না। দূরে দূরে থাকব। যেমন চাকরি করছি তেমনি করব। তুমি শুধু মাঝে মাঝে এসো আমার কাছে—তাহলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তোমার আর একটা বউ থাকলেও আমার আপত্তি হবে না।"

নিরু এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার পিঠে মুখ রাখলে।

বললাম, "ধার-ধোর করে' কালই তাহলে গোটা দুই নৌকো কিনতে হয়।"

"নৌকো? কেন!"

"দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলাটা প্র্যাকটিস করে' নিতে হয়। অভ্যাস তো নেই—"

নিরু ছোট্ট চড় মারলে আমাকে।

"খালি ইয়ার্কি। 'পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক' কখন বোঝাবে। রাত তো অনেক হল—"

"আগে 'ম্যারেজ ফর ম্যারেজেস্ সেক'টা বোঝা হয়ে যাক। আমি তোমাকে বরাবর 'মিডিয়কার' ভেবে এসেছি, এখন দেখছি তুমি জিনিয়াস!"

নিরুর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে' উঠল। চুপ করে রইল। তারপর বলল, "এতক্ষণে ঠিক চিনেছ। সব মেয়েরাই সেই জিনিয়াস যার মানে ভূত বা পেত্নী। আমরা একবার ঘাড়ে চড়লে অর নাবি না। ইহকালে তো বটেই, পর-কালেও চড়ে থাকি। উঃ, কি অসহায় আমরা, লেখাপড়া, চাকরি, কিছুই আমাদের কোন কাজে লাগে না—"

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ল নিরু। আমার কোলের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বেশ বেকায়দায় পড়ে' গেলাম।

দশ

ফুলুর কথা

দ্বিজেনবাবু সাইড্‌কার-ওলা বাইক কেন কিনেছেন তা আর কেউ না বুঝুন আমি বুঝেছি। মৃদুলাও বুঝেছে। অদ্ভুত মেয়ে ওই মৃদুলা। সব জানে সব বোঝে, ঠিক বিপদের সময়টিতে গিয়ে সব সামলে দেয়, অথচ কথাটি বলে না। সুখেনদা আর অবনীশবাবু যখন ওদিকে বসে' গল্প করছিলেন তখন শুকুল ঠাকুর যে কাণ্ডটি করেছিল মৃদুলা না থাকলে হয়েছিল আর কি। আমরাও তো বসেছিলাম কিন্তু আমরা কেউ টের পাই নি, এমন কি শুকুল ঠাকুরও পায় নি। হঠাৎ মৃদুলা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। শুনতে পেলাম বলছে—নাবাও নাবাও শিগগির হাঁড়িটা নাবাও, তলা ধরে গেছে। অন্য একটা হাঁড়িতে ঢেলে ফেল, তলাটা চেঁচো না, যেমন আছে তেমনি থাক। কয়েকটা রসুন ঘিয়ে ভেজে দাও এবার, কিছু বোঝা যাবে না। তার-পর দেখি বাটি করে' নিয়ে এসেছে একটু। আমাকে বললে চেখে দেখতো ফুলু, পোড়া গন্ধ পাচ্ছ কিনা। মাংসে পোড়া গন্ধ ছাড়লে শুকুল ঠাকুরকে আর আস্ত রাখবে না সুখেন-দা। চেখে দেখলাম একটুও পোড়া গন্ধ নেই। শুনেই চলে গেল মৃদুলা। অন্য মেয়ে হ'লে এই নিয়ে কত বাহাদুরিই করত। মৃদুলা চুপ একেবারে। পানি-শঙ্খ প্যাটার্নের কথা মৃদুলাই তো বললে আমাকে। সুখেনদার নাকি খুব পছন্দ ওই প্যাটার্নটা। ভাগ্যে নিরুদিকে পেয়ে গেলাম, গোড়ার দিকটা দেখিয়ে না দিলে বই দেখে পারতুম না আমি।

"কি বুনছ দিদি—"

বাবা, চমকে উঠেছি। রামধনের বউটা ঘুমোয়নি

এখনও ? সেই থেকে ঠায় চেয়ে আছে আমার দিকে।

"সোয়েটার বুনছি—"

"কার জন্যে।"

"তুমি কাউকে বলে' দেবে না তো ?"

"না।"

"সুখেনবাবুর ভাইয়ের জন্যে।"

"দ্বিজুবাবু না বিজুবাব

"দ্বিজুবাবু কাউকে বোলো না যেন।"

"না, বলব না—"

কি রকম চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমার ঘরে ছবির পিছনে যে টিকটিকিগুলো আছে, আলো জ্বাললে তারা বেরিয়ে আসে আর ঠিক ওই রকম করে' চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। দুৎ, সব জড়িয়ে গেল আবার। অন্যমনস্ক হলে কি আর বোনা যায়। গোলমালের ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম, এখানে রামধনের বউ জ্বালাতে লাগল। অদ্ভুত ওর চাউনি, শান্ত অথচ অন্যমনস্ক করে' দেয়। এমন করে' চেয়ে থাকার মানেই বা কি।

"ঘুমোও না তুমি ঝুনুর মা। জ্বর হয়েছে তোমার।"

"ঘুম আসছে না।"

"ওপাশ ফিরে শোও, তাহলেই ঘুম আসবে। চোখ বুজে থাক।"

ভারি বাধ্য। বলার সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে শু'ল। •

...বাইকে চড়ে' দ্বিজুবাবু এসেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন এত রাত্রে। এত ছটফটে লোক, একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে বসবে না, আপিসেও এই কাণ্ড। একদিন গিয়ে দেখেছি তো। কখনও ওপরে, কখনও নীচে, চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ দেরাজ খুলে ঘাঁটতে লাগল কি সব, এক গাদা চিঠি বার করে' কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়তে লাগল, পট করে' ঘণ্টাটা টিপে চাপরাসীকে ডাকলে, তারপর আমার দিকে

ফিরে বললে—চায়ের সঙ্গে টোস্ট আর ওমলেট্ আনাই? 'ওমলেট্'! আমি তো মামলেট্ জানতাম—তবে আমি মুখ্য মানুষ। বললাম, "বেশ তো আনাও।" আমার লোভ কেকে, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না সেটি। লুকিয়ে গেছি তো! বেশি বাড়াবাড়ি করা কি চলে! কেক আনতে গেলে আবার দেরি হয়ে যেত হয়তো। তা'ছাড়া বলতে লজ্জাও করল। পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েদের হ্যাংলামি প্রকাশ করাটা কি উচিত? মুখ ফুটে একবার বললেই ফেরাজিনি বা ফিরপোতে লোক দৌড়ত জানি, কিন্তু বলতে পারলাম না। কলেজ থেকে লুকিয়ে গেছি তো! বার বার তখন ঘড়ির দিকে চাইছি আর বলছি—আমাদের থার্ড পিরিয়ড দু'টোর সময় আরম্ভ হবে কিন্তু। আমার দিকে না চেয়েই বললে—এক মিনিট, এইগুলো সই করে দিই: আজ ডাকে পাঠাতেই হবে। ঘস ঘস করে' সই করতে লাগল। সেই সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম সোয়েটারটা। চমৎকার রং, চমৎকার ফিট্ করেছে। জিগ্যেস করলাম—সোয়েটারটা কিনেছ না কি, চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। কোন উত্তর দিলে না, ঘস ঘস করে' সইই করতে লাগল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলাম. মাকড়সার ঝুল হয়েছে দেখলাম কোণে কোণে। কেন হয়েছে বুঝতে কষ্ট হল না। চাকরের গাফিলতি নয়, নিশ্চয় সময় মতো ঘরই খোলা হয় না কোন দিন, ঝাড়বে কখন বেচারা। পালকের তৈরি একটা হাতঝাড়ুও একটা সেল্‌ফে রাখা আছে দেখতে পেলাম। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। উঠে নিজেই সেটা নিয়ে কাছে যে ঝুলগুলো ছিল ঝাড়তে লাগলাম, নাগালের মধ্যে যতটা পেলাম, সোয়েটারের কথা ভুলেই গেছি, হঠাৎ সই করতে করতেই ঘাড় না ফিরিয়েই বললে—

"সোয়েটার কিনি নি। সুখেনদা বুনে দিয়েছে—"

"সুখেনদা বুনতে পারেন না কি?"

সই করতে করতেই, ঘাড় না ফিরিয়েই উত্তর দিলে—"শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাত খুন মাপও করেন।"

সই শেষ হল, ঘাড় ফিরল।

"ও কি করছ তুমি—শাড়িতে মাকড়সা উঠেছে যে একটা—কি পাগলামি—"

তাড়াতাড়ি উঠে এসে রুমাল দিয়ে আমার শাড়িটা ঝাড়তে লাগল। সেই সময় কেরানী, না কে এল একজন, লজ্জায় পড়ে গেলাম আমি। ওর কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত নেই, ঝেড়েই চলেছে, আমি যেন একটা আসবাব।

চা-ওমলেট্ শেষ হবার পর দেখলাম আর দশ মিনিটের মধ্যে যদি কলেজে না পেঁাছতে পারি, ক্লাসে যাওয়া হবে না। বললাম, সে কথা। বললাম পারসেনটেজ থাকবে না।

"চল এক্ষুণি পেঁাছে দিচ্ছি তোমাকে—"

সেই সময় ফাইল হাতে করে' আর একজন ঢুকল। ঠিক বোমায় আগুন দিলে কেউ যেন। যাচ্ছেতাই করলে লোকটাকে।

"এতক্ষণ কি করছিলেন? বলিনি আপনাকে যে, সাড়ে বারোটার ভিতর সব তৈরি রাখবেন।"

মুখ চুন করে' দাঁড়িয়ে রইল বেচারী।

"অপেক্ষা করুন। আমি আসছি এখুনি ঘুরে—".

তড়বড় করে' নীচে নেমে গিয়ে নিজের মোটর বাইকটা বার করলে।

"অমার পিঠের দিকে বসতে পারবে আমাকে ধরে'।"

"না, সে আমার বড় লজ্জা করবে।"

"লজ্জা? কিসের লজ্জা—কি মুশকিল—"

ট্যাক্সি করে' যেতে হল। ভাড়াটা আমি দিতে গেলাম, নিলে না কিছুতে। আজ দেখছি সাইড্‌কারওলা বাইক।

খবরটা মৃদুলা আগেই দিয়েছিল আমাকে।

রামধনের বউ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে মড়া যেন। ভয় করছে আমার।

"ঝুনুর মা, ঘুমুলে না কি?"

"না।"

"ঘুমোও।"

"ঘুম আসছে না।"

"চোখ বুজে থাক।"

"চোখ বুজেই আছি।"

পাশেই ওর ছোট ছেলেটা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর চোখে ঘুম নেই। ও চুপ করে জেগে আছে এতেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কথা কইলে এত অস্বস্তি লাগত না। কিন্তু ও শান্ত মানুষ, ও তো কথা কইবে না, তার ওপর জ্বর হয়েছে। ঘুম হচ্ছে না কেন ওর, আশ্চর্য!

"মৃদুলা দিদি কি আসবে এখানে?"—হঠাৎ জিগ্যেস করলে।

"মৃদুলাদি? জানি না তো—আসবে না বোধ হয়, ওখানে ব্যস্ত আছে নানা কাজে। এতগুলি লোক খাবে তো।"

চুপ করে' রইল। ভারি চুপচাপ মেয়েটি, জ্বর হয়েছে বলে' নয়, যখন ভাল থাকে তখনও। ব্রাহ্মণের মেয়ে কি না, ভদ্র খুব। শুনেছিলাম রামধন সুখেনবাবুর আত্মীয় হয় দূর সম্পর্কের। হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ে কষ্ট পাচ্ছিল, সুখেনবাবুই এনে বসিয়েছেন এখানে। আহা, আমিও যদি ব্রাহ্মণ হতাম। বাইরে মুখে যতই আস্ফালন করি ব্রাহ্মণত্বের দিকে লোভ আছে বই কি। অব্রাহ্মণ গলায় পৈতে ঝোলালেই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ সাজবার চেষ্টা করেন আজকাল অনেক অব্রাহ্মণ, চেষ্টা কিন্তু সফল হয় না। পৈতে নিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, তর্ক করে', যুক্তি

দেখিয়ে অনেক রকম চেষ্টা অনেকে করছেন—কিন্তু সফল হচ্ছে না। বাইরে মুখে কিছু না বললেও অব্রাহ্মণকে মনে মনে সকলেই অব্রাহ্মণের শ্রেণীতেই বসিয়ে রেখেছে। অনেক অব্রাহ্মণ আজকাল দেখি ব্রাহ্মণের ছেলে-মেয়ের প্রণাম কুড়োবার জন্যে ব্যগ্র, পা বাড়িয়ে দিতে আপত্তি করেন না। আমাদের বাগানে একটা ল্যাংড়া আমগাছের মাথার উপরে পরগাছা হয়েছিল একবার। সেটাকে পরগাছা বলে' চিনতে কারও ভুল হয়নি। ল্যাংড়া গাছের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল বলে খাতিরও করে নি তাকে মালি। কেটে ফেলে দিয়েছিল। আহা আমি যদি ব্রাহ্মণ হতাম, আর দ্বিজেনবাবুর পালটি ঘর হতাম যদি, কি সুবিধেই হ'ত তা'হলে। দ্বিজেনবাবু জানেও না যে তার সেদিনকার কথাগুলো আমার মনে কি রকম দাগ কেটে বসে' গিয়েছিল—"সুখেনদা শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাতখুন মাপও করেন।" সেই দিনই উল-বোনার বই, কাঁটা, উল সব কিনিছি আমি। আঃ—আবার সব জড়িয়ে গেল, দূর ছাই!

"ঝুনুর মা, কেমন আছ—"

একি মৃদুলা সত্যিই এসে হাজির হল যে! আরও জড়িয়ে গেল আমার সব। বলটা গড়িয়ে গেল মেজেতে—দুত্তোর!

"ফুলু, চল খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিমাইবাবুকে নিয়ে দ্বিজুদা এসে গেছেন। ঝুনুর মা কেমন আছ তুমি—"

"ঘুম আসছে না কিছুতে।"

"আসবে এখুনি। পেট্রোম্যাক্সটার জন্যেই ঘুম আসছে না বোধ হয়। ওটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।"

মৃদুলা তার মাথার শিয়রে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"মৃদুলা দেখনা বোনাটা কেমন হচ্ছে—"

নিয়ে গেলাম তার কাছে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো, কি পরিষ্কার হাত তোমার—"

"পরিষ্কার না ছাই।"

"সত্যি চমৎকার হয়েছে। সুখেনদাকে দেখিও, সুখেনদা এবিষয়ে অথরিটি—"

"তুমি দেখিও, আমার লজ্জা করবে। দেখাবে?"

"দেখাব। চল এবার। জায়গা হয়ে গেছে—। ঝুনুর মা ঘুমোক, ভজুয়া বসে থাক বাইরে—"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়েছে ঝুনুর মা। মৃদুলার স্পর্শটুকুর প্রত্যাশায় জেগেছিল যেন!

এগার

অবনীশের কথা

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন প্রস্তাব করলে চেয়ারগুলো মাঠে নিয়ে গিয়ে বসা যাক। আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিল না বাইরে বসতে। একা থাকলে হয়ত গিয়ে বসতাম, কিন্তু দ্বিজেন আর নিমাইয়ের সঙ্গে বসে' পলিটিক্স বা সমাজনীতি আলোচনা করবার উৎসাহ পাচ্ছিলাম না এই জ্যোৎস্নারাত্রে। সুখেনের অদ্ভুত গল্প আর ফাঁকা মাঠের জ্যোৎস্না, মৃদুলার নাতিস্পষ্ট অস্তিত্ব (মৃদুলার সম্বন্ধে কি বলব তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—কারণ কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায় এরকম কিছু যে লক্ষ্য করি নি তা নয়, কিন্তু আমার মনে যা জাগছে তা ওই পর্যবেক্ষণের ফল যে নয়, তা যে অসম্ভব রকম আরও অনেক বেশী কিছু, তা-ও অনুভব করছি—আর সেই অনুভূতিটাকে আরও রঙ চড়িয়ে আরও অসম্ভব করে' তুলতেই ভাল লাগছে কেন জানি না)—এই সব মিলেমিশে মনের যে অবস্থা হয়েছে তাতে পলিটিক্সের কচকচি বা সমাজ-সংস্কারের গুরু-গম্ভীর আলোচনা বরদাস্ত করা শক্ত এখন আমার পক্ষে। বারান্দার উপর ইজি চেয়ারটার উপরই শুয়ে আছি। বিজেন খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেল। নিরু আর ফুলুও চলে গেল রামধনের বাড়ি, সেখানেই নাকি ওরা শোবে, এখানে স্থানাভাব। সুখেন, দ্বিজেন আর নিমাই সামনের মাঠে তিনখানা চেয়ার নিয়ে বসেছে। জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে কি একটা তর্ক উঠেছে বুঝতে পারছি। ভাগ্যে চতুর্থ চেয়ার আর বাড়িতে নেই, থাকলে আমাকেও গিয়ে বসতে হত ওদের সঙ্গে। সুখেন বলেছিল একবার—

"চল না, এই ইজি চেয়ারটাই ধরাধরি করে' মাঠে নাবাই।' দ্বিজু একাই পারবে হয়তো, ওই জগদ্দল মোটর-বাইকটা যেরকম ওঠাচ্ছে নাবাচ্ছে—"

বললাম, "থাক, এইখানেই বেশ আছি আমি। তোমরা গল্প কর, আমি ততক্ষণ এক চটকা ঘুম দিয়ে নি—"

বেশ—"

যাবার সময় সুখেন আমার কানে কানে বলে' গেল, "ওরা যাক, তারপর গল্পটা শুরু করা যাবে।"

ঘুম কিন্তু আসছে না। চোখ বুজে পড়ে আছি। চোখ দুটো পুরো বোজে নি। দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে আবছা-ভাবে যা দেখতে পাচ্ছি, তা ঠিক জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠ নয়, তা বিদ্যুতালোকিত ছোট ঘর একটি, ঘরের কোণে ফোন রয়েছে, মৃদুলা ঘরে ঢুকল, ফোনে কার সঙ্গে কথা কইতে লাগল—

"একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমাদের কিছু কাচের প্লেট, গ্লাস আর আসন চাই। লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন? তাহলে তো খুব ভাল হয়। তাদের ভাড়া দেব। না, না, ভাড়াটা নিতে হবে বই কি। মিছিমিছি আপনাদের খরচ করাবো কেন? হ্যাঁ, দু'ডজন করে' হলেই হবে—আচ্ছা—আচ্ছা।"

স্পষ্ট শুনতে পেলাম মৃদুলার কথাগুলো। সুখেন যদিও বলে নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি মৃদুলা কে। ফুলু নিরু বেরিয়ে গেছে। মৃদুলা কিন্তু যায় নি। কি করছে ও? কোথায় আছে? নিরুর মুখখানা কেমন যেন মনে হল, একটু বেশী গম্ভীর, নিরু একটু গম্ভীরই কিন্তু ওর গাম্ভীর্যের তলায় যে কৌতুকটা প্রচ্ছন্ন থাকে সেটা যেন নেই মনে হল, ঘরটা আছে কিন্তু ঘরের আলোটা যেন নিবে গেছে। ওর সঙ্গী দরকার একটি। বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। দু'জনে একটু মাখামাখি হয়েছে

মনে হচ্ছে। সুখেনের কাছে পাড়ব না কি কথাটা। ঝির ঝির করে' হাওয়া এল একটু পিছন থেকে! এসেই চলে গেল। হাওয়া নয় যেন পিওন, চিঠি দিয়ে গেল, সেই চেনা অথচ অচেনা গন্ধটার চিঠি। মৃদুলা কাছেই আছে তা'হলে কোথাও। তাকে দেখবার প্রলোভনটা সম্বরণ করতেই অনেকখানি সময় এবং শক্তি খরচ হল। আধবোজা চোখের ফাঁকে ফাঁকে নূতন ছবি ফুটে উঠেছে ইতিমধ্যে। সীমাহীন সমুদ্রে তিনটে লোক হাবুডুবু খাচ্ছে, প্রাণপণে সাঁতারাচ্ছে। তিনটে কালো কালো মাথা দেখতে পাচ্ছি—সুখেনের, নিমাইয়ের আর দ্বিজেনের। সমুদ্রটা জ্যোৎনার। হাওয়া-হরকরা আবার এল। দিয়ে গেল সুগন্ধি চিঠি। হেরে গেলাম। আত্মসম্মানবোধ আর পোশাকী বিবেককে পরাজয় মানতে হল কৌতূহলের কাছে। জুতো খুলে নিঃশব্দে উঠলাম। দেখলাম দ্বিজেন নেই, সুখেন আর নিমাই বসে আছে। তর্ক করছে। নিঃশব্দচরণে ঘরে ঢুকে দেখি ওদিকের কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। পেট্রোম্যাক্স। কি করছে মৃদুলা ওখানে বসে'। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। দেখা পেলাম এবার। উল বুনছে বসে' মৃদুলা। নিবিষ্ট চিত্তে বুনছে। পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলোয় মুখের একপাশটা দেখা যাচ্ছে শুধু। রং ধপধপে সাদা নয়, গোলাপীও নয়, সোনালী, হঠাৎ মৃদু হাসি, অতি মৃদু, ফুটে উঠল তার মুখে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—
''দেশলাই খুঁজছেন বুঝি। দিচ্ছি, দাঁড়ান''—

—শুধু বিস্ময় নয়, আমার কেমন যেন আতঙ্ক হল। ঠিক ওই অজুহাতটাই মনে মনে খাড়া করেছিলাম আমিও, যদি ধরা পড়ে' যাই বলব দেশলাই খুঁজছি।

বললাম, ''ঠিক ধরেছ। দেশালাইটা ফুরিয়ে গেল। তুমি কি করে' বুঝলে দেশলাই খুঁজছি।''

"যে রেটে সিগারেট খাচ্ছেন সন্ধ্যে থেকে, দেশলাই ফুরোবে না? ক'টাই বা কাঠি থাকে একটা বাক্সে।"

উঠে এল। ঘরে ঢুকে নূতন এক বাক্স দেশলাই বার করে দিলে আমাকে। আমার জন্যেই রাখা ছিল যেন!

"এত রাত্রে সোয়েটার বুনছ যে। বাইরে এমন জ্যোৎস্না—"

"আমি বুনছি না। এটা ফুলু বুনেছে, আমি একটু ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছি। ভোরে ও নিয়ে যাবে কিনা।"

"ও—"

চলে এলাম। এসেই কানে গেল সুখেন নিমাইকে বলছে, "জাতিভেদ আছে। প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে সেটা, আমরা শুধু সেটা মানছি—"

নিমাই হেসে উঠল জোরে। মনে হল হাসি নয় হ্রেষা।

"মানো তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওই মানাটাকে নিয়ে আস্ফালন কোরো না। প্রকৃতির নিয়ম নির্বিচারে মানে পশু, মানুষ সে নিয়ম উলটে দেয়। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব।"

সুখেন আমতা আমতা করে' বললে—"হতে পারে মনুষ্যত্ব। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব লাভ কি সবাই করতে পারে? এতগুলো বেড়া ডিঙোনো কি সোজা কথা।"

"তুমি তো হার্ডল রেসে ফার্স্ট হ'তে বরাবর। তোমার মুখে একথা মানাচ্ছে না।"

সুখেন চুপ করে' রইল।

তারপর বললে—"দ্বিজু তর্কটি তুলে দিয়ে সরে পড়ল আর তুমি রাত দুপুরে কেন যে জাতিভেদ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করতে লাগলে সেইটে আমার মাথাতে ঢুকছে না কিছুতে।"

নিমাই গম্ভীরভাবে বললে—"সবগুলো না পার একটা

বেড়া তোমাকে ডিঙোতেই হবে। তুমি নিজে না পার আমি পাঁজাকোলা করে' তুলে নিয়ে যাব—"

"কি যে উদ্দেশ্য তোদের বুঝতেই পারছি না—। কিসের বেড়া? বেড়া মানে?"

"জাতিভেদের।"

"তার মানেটা কি--"

"তুমি অন্ধ না কি!"

"পাওয়ার একটু কমেছে, কিন্তু একেবারে অন্ধ হইনি।"

ঠিক এই সময় নিমাই ডাক্তার লক্ষ্য করলে যে আমি ঘুমোচ্ছি না, সিগারেট ধরাচ্ছি। উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। বললে, "চল, দেখি দ্বিজু কোথা গেল। রাত্রেই ফিরতে হবে আমাকে।"

সুখেনকে নিয়ে নিমাই চেয়ার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। বুঝলাম গোপনীয় কথা। আমার কানের জন্য নয়। দেখলাম কিছুদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কথাই কইতে লাগল। নিমাই ডাক্তার মাঝে মাঝে আকাশের দিকে হাত তুলে তুলে কি একটা নক্ষত্র দেখাতে লাগল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। শুয়ে পড়লাম ইজি চেয়ারেই অবার। মনে হল আমি ঠিক বোধ হয় খাপ খাচ্ছি না এদের সঙ্গে। প্রথমত অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, দ্বিতীয়ত লণ্ডনের ভাল ডিগ্রি পেয়েছি একটা, তৃতীয়ত এই তুচ্ছ ঘটনাটার উপর এদেশের কাগজওলারা দু'চার পোঁচ রং চড়িয়েছে, আমার ছবি ছেপেছে, আমি যে কোথায় কত টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি সে খবরটাও জানিয়েছে সবাইকে, ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা আমার পক্ষে মর্মান্তিক। শুধু পর নয়, শত্রু হয়ে পড়েছি অনেকের। আমি যে উন্নতি করেছি এইটেই আমার অপরাধ। বিলেতে যাবার আগে যে স্থানটি ছেড়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসে সে স্থানটি

খুঁজে পাচ্ছি না আর। সবাই দেঁতো হাসি হেসে ভদ্রতা করছে, একমাত্র সুখেন ছাড়া। ওই কেবল বদলায় নি। সুখেনের টানেই এখানে আসা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সুখেন টানটার বাহক, অদৃশ্য কোন শক্তি আমার অজ্ঞাতসারেই সম্ভবত আমাকে টেনে এনেছে এখানে। গভীর অরণ্যেও ফুল ফুটলে মধুকরের দল তার উদ্দেশ্যে ছুটে আসে, তারা ফুলটাকে দেখে আসে না, এসে তবে দেখে। সুখেন আর নিমাই ওই বাঁকটার মোড়ে অন্তর্ধান করল দেখছি। নিমাই-ডাক্তারের মতলবটা কি তা বোঝা যাচ্ছে কিছু। কিছু একটা আছেই। সুখেন এলে বোঝা যাবে সেটা। সুখেন...আশ্চর্য হচ্ছি, একটা কথা ভেবে। ওদের গোপন পরামর্শে আমি যোগ দিতে পারিনি বলে, আমাকে ওরা বাদ দিয়েছে বলে' কেমন যেন একটু অপমানিত বোধ করছি। অথচ বাদ দেবার মত কারণ তো থাকতে পারে। ...দিগ্বলয়ে কোনও মেঘ নেই, সেই মেঘের ময়ূরপঙ্খী কোথায় ভেসে চলে গেছে, অজানা নদীর স্রোতে, অজানা সমুদ্রে। গাছগুলো কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। আকাশের গায়ে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দিয়ে যে ছবি এঁকেছে তারা সে ছবির একটি রেখাও পরিবর্তিত হয় নি, ওরা মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে অচল হয়ে আছে। কিন্তু না, ওরাও অচল হয়ে নেই, ওরাও চলছে, পৃথিবীতে কিছুই স্থির নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই ছুটে চলেছে সেকেন্ড প্রায় আঠারো মাইল বেগে...তন্দ্রার ভিতর মোটর বাইকের শব্দটা শুনলাম, খুব জোরে বেরিয়ে গেল...মনে হল বিরাট একটা মোটর-বাইকে চড়ে সবাই চলেছি, মহাশূন্য ভেদ করে··মোটর-বাইকটা গোল...সেকেন্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটেছে...নক্ষত্রদের দল কাছে আসছে আবার সরে' যাচ্ছে...নিমাই যেন সুখেনকে বলছে এখনও জাতিভেদের বেড়াটা পার হ'তে পারনি?

"অবন, ঘুমুলি না কি—"

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সুখেনের জন্য মনে মনে অপেক্ষাও করছিলাম, মনের ভিতর জেগেই ছিলাম। উঠে বসলাম।

"দাঁড়া আসছি—"

বলেই সুখেন ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ বেরুল না।

"চিপ্ চিপ্ চিপ্", সেই পোকাটা ইঙ্গিতে কি যেন বলল আবার। সিগারেট বার করলাম। সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ধীরে ধীরে দেশলাই কাঠিটা বার করলাম, কিন্তু জ্বালতে সাহস হল না, মনে হল বিস্ফোরণের যে অনিবার্য শব্দটা হবে তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ঘুমন্ত শহরের বুকে অ্যাটম বম পড়লে যে সর্বনাশ হয় তার চেয়েও ঢের বেশী সর্বনাশ, একটা সৃষ্টি বুঝি চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। 'চিপ্ চিপ্ চিপ্' পোকাটাও মনে হল সাবধান করছে। বসে' রইলাম চুপ করে'। কতক্ষণ বসে' ছিলাম জানি না, পিছনেব ঘর থেকে গুঞ্জন হচ্ছে মনে হল। মনে হল অনেক দূরে যেন নূপুর বাজছে। মৃদুলার সঙ্গে সুখেন কথা কইছে? কি কথা...! হঠাৎ সুখেন জোরে কথা ক'য়ে উঠল।

"ফুল? ফুল করেছে এটা! চমৎকার হয়েছে তো, এমন চমৎকার আমিও পারতাম না..."

তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল আবার। একটু পরে সুখেন বেরিয়ে এল। বগলে একটা মাদুর হাতে একটা তাকিয়া।

"চেয়ারে বসতে আর ভাল লাগছে না। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসা যাক একটু। মৃ যে হোল্ডলের ভিতর আমার তাকিয়াটা এনেছিল তা জানতামই না—"

আমার চেয়ারের সামনে সড়াৎ করে মাদুরটা পেতে

ধপাস করে তাকিয়াটা ফেললে তার উপর। আমার আচ্ছন্ন• ভাবটা কেটে গেল। সিগারেটটা অসঙ্কোচে ধরিয়ে ফেললাম। দোমড়ানো তাকিয়াটায় চাপড় মারতে মারতে অস্ফুটকণ্ঠে সুখেন যেন তাকিয়াটাকে সম্বোধন করেই বললে—"ধারণাই বদলে গেল। কত ধারণাই যে বদলাতে হবে জীবনে। যাক ভালই হল। আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু। ওরা থিতু হয়ে বসুক এইতো আমি চাই, ওরা নিজেদের সংসার বুঝে নিলেই আমি সটান কাশী কিংবা হরিদ্বার! এ সব ঝামেলার মধ্যে আর থাকছি না।..."

আবার তাকিয়া চাপড়াতে লাগল। তাকিয়ার দিকে চেয়েই বলল আবার—"আমার ধারণাটা অন্য রকম ছিল। একদম বদলে গেল। ধারণা জিনিসটা অদ্ভুত, কিছুতেই একরকম থাকে না, কি বলিস—"

এইবার আমার দিকে চাইলে সুখেন।

বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক মেঘের মতন। চেহারা তো বদলায়ই, অনেক সময় লোপও পেয়ে যায়।"

"ঠিক বলেছিস্—" বলেই আবার তাকিয়াটা নিয়ে পড়ল।

কাছেই যে থামটা ছিল তার গায়ে খাড়া করে' রেখে ঠেস দিয়ে বসল তাতে। এইবার মনোমত হল। আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাইলে।

"কি ধারণা বদলাল তোমার?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ও আর একটা প্রশ্ন করে' বসল। "জাতিভেদ মানিস তুই?"

"নানারকম জাতি আছে যখন, তখন সেটা মানতে হবে বই কি। কিন্তু সেটাকে দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনি করি না।"

ভুরুকে যতদূর কোঁচকানো সম্ভব ততদূর কুঁচকে সুখেন আমার হাঁটুর দিকে চেয়ে রইল। আমার মনে হল

ও এ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চাইছে আমার কাছে।

বললাম, "হিমালয় আছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেই হিমালয়কে ডিঙিয়ে যাবার যখনই প্রয়োজন হয়েছে মানুষের, মানুষ ডিঙিয়ে গেছে—"

"নিমাই এতক্ষণ বেড়া বেড়া করে চেঁচাচ্ছিল, তুমি সেটাকে একেবারে হিমালয় করে' তুললে! বেড়াই বল, আর হিমালয়ই বল, আমি জানি জীবনে দু'টি জিনিসই হল আসল, তা বেড়াও নয়, হিমালয়ও নয়—তা এই—"

এই বলে সুখেন একবার কপালে আর একবার বুকে হাত দিলে।

"এই দু'টি জিনিসই চালাচ্ছে সকলকে, চালাবেও চিরকাল। ওরাই প্রেমিক, ওরাই ঘটক। তাছাড়া এটা নিমাই ধরেই বা নিলে কেন যে আমি আপত্তি করব! নক্ষত্র-টক্ষত্র দেখিয়ে একেবারে ঘাবড়ে দিলে আমাকে! ওকি মনে করে আমি—"

বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আবার আমার হাঁটুর ওপর।

"ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। তুমিই বল না, যে মেয়েকে বরাবর বড়লোকের ভ্যাবাগঙ্গারাম আদুরে মেয়ে বলে ধারণা করে রেখেছিলাম, হঠাৎ যদি আবিষ্কার করি যে, সে ঠিক একেবারে উল্টোটি,—স্বচক্ষে আমি দেখে এলাম রামধনের বউকে ও হাওয়া করছে বসে', স্বচক্ষে এক্ষুণি দেখলাম এমন সোয়েটার বুনেছে যা আমার—প্লীজ নোট—আমার সুদ্ধ তাক লেগে গেল। মু বললে আনারসের চাটনিটা ও-ই করেছে বিকেলে এসেই, আমি তখন ছিলাম না, রামধনের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে টুক করে' কখন চাটনিটা করে' রেখেছে। এসব জানবার পরও জাতি-ভেদের মানে হয় কোনও—"

আমার দিকে চেয়ে এমনভাবে প্রশ্নটা করলে যেন আমিই জাতিভেদের প্রশ্ন তুলে বাধা সৃষ্টি করছি।

"কার কথা বলছ—"

"ফুলুর! দ্বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। নিমাই সুপারিশ করতে এসেছিল। মেয়েটি যখন সত্যিই লক্ষ্মী তখন আবার জাতের কথা কেন। লক্ষ্মীর কি জাত আছে?

"কি বলিস্ তুই—"

"বেশ, ভালই তো।"

"তোর আপত্তি নেই?"

"কিছুমাত্র না। আমার আপত্তি থাকবে কেন?"

"ঠিক মন থেকে বলছিস—?"

"মন থেকেই বলছি। ফুলু মেয়েটি ভাল, নিরু তো উচ্ছ্বসিত। খুব সরল না কি।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ভয় হচ্ছিল তুই পাছে আপত্তি ক'রে বসিস।"

কথাটার তাৎপর্য তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে সুখেন হঠাৎ বলে উঠল—"আশা করি মামা মামীও খুশী হবেন। মামা তো নামজাদা লিবারল ছিলেন, মুসলমান বাবুর্চির হাতে প্রকাশ্যে মুরগীর মাংস খেয়েছেন কতবার। মামী বাইরে ছুঁই ছুঁই করতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও কিছু কম উদার ছিলেন না। তোকে তো বলেছি—ওই কুড়োনী মেয়েটাকে প্রণাম করতে স্বচক্ষে দেখেছি আমি। তখন কেউ জানতই না যে ও কি জাতের মেয়ে—"

"গল্পটা তুই ভাল করে বললিই না তো—"

"এইবার বলব, কফিটা খেয়ে নিয়ে জুৎ করে' বলা যাবে।"

"এখন আবার কফি কেন—"

মৃ করছে যে। ও স্পিরিট স্টোভ সঙ্গে করে' এনেছে, না খাইয়ে ছাড়বে কি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভজুয়া দু'পেয়ালা কফি নিয়ে এল। সুখেন ধমকে উঠল—"আগে তেপায়াটা আন। রাখবি কিসের উপর?"

"এই যে আমি এনেছি—"

তেপায়াটা রেখেই মৃদলা চলে' গেল ঘরের ভিতর।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। দেখলাম আবার, একটা মেঘ এসেছে দিগ্বলয়ের এক প্রান্তে। জ্যোৎস্নামণ্ডিত দুগ্ধধবল স্বপ্ন যেন একটা।

বারো

নিরুর কথা

ছি, ছি, কি কাণ্ড করে ফেললাম আমি তখন! আমি যে এতটা আত্মবিস্মৃত হ'তে পারি তা কল্পনাও করি নি কোনও দিন। কেঁদে ফেললাম? ছি, ছি। বিজুদার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আয়নাতে নিজেই নিজের মুখের দিকে আর চাইতে পারব না। রামধনের বাড়িতে তাদের দেওয়ালে-টাঙানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম একবার, সরে' আসতে হল। লজ্জা করল। ভেবেছিলাম রামধনের বাড়িতেই একধারে কোথাও শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু মৃদুলা যে ফরমাসটি করেছে তা করতে হলে রাত্রে ঘুমোনো যাবে না। এত রাত্রে শুয়ে অত ভোরে আর ঘুম ভাঙবে না। তাছাড়া ওখানে শোওয়ার অসুবিধাও আছে। ঝুনুর মায়ের জ্বরটা বেড়েছে। ফুলু বসে' হাওয়া করছে তাকে। আমি যতক্ষণ ছিলাম ফুলু কেবলই গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফিস ফিস করে' গল্প করছিল আমার সঙ্গে। এতে আমার তো ঘুম হ'তই না, মাঝ থেকে ঝুনুর মায়েরও ঘুম ভেঙে যেত। চলে এলাম তাই। বিজেনদা কিন্তু গেল কোথায়। খেয়ে উঠেই কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। ওই তো সেই টিলা, যার উপর আমরা বসেছিলাম একটু আগে। কেউ তো নেই ওখানে। কোথায় গেল তাহলে...। রাজুই বা গেল কোথায়? বাংলোতে ফিরে যাব না কি। কিন্তু সেখানে দাদা আর সুখেনদা হয়তো গল্প জমিয়েছেন। আমি গেলেই বাধা পড়বে। দ্বিজুবাবু তো নিমাই ডাক্তারকে পেঁছুতে গেল। সুখেনদা নিশ্চয় গল্প ফেঁদেছেন আবার।

আর মৃদুলা ঘরের ভিতর ঘোরা-ফেরা করছে অলক্ষ্যে। আড়ালে একা একা থাকতেই ভালবাসে মেয়েটা। অদ্ভুত মেয়ে মৃদুলা। খুব ভাল, কিন্তু কেমন যেন আন্‌ক্যানি, ঠিক সহজ হওয়া যায় না ওর কাছে। রাজু যাকে দেখে ভূত মনে করেছিল একটু আগে, সে আর কেউ নয়, মৃদুলাই। একটু আগে অন্ধকার কোণের বারান্দায় বসে' বসে' ও যখন ডিশগুলো মুছে মুছে রাখছিল তখন আমারও যেন মনে হচ্ছিল ওর গা থেকে একটু একটু আলো বেরুচ্ছে। দূর থেকে দেখেছিলাম অবশ্য, কাছে গিয়ে আর বুঝতে পারলাম না, বরং মনে হল দক্ষিণ বারান্দায় যে পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলছে তারি ঝলক বুঝি। মেয়েটি কিন্তু আন্‌ক্যানি! অথচ ভাল খুব।··কে আসছে দূরে...মেয়ে মনে হচ্ছে, ওড়না রয়েছে গায়ে। এই দিকেই আসছে। মৃদুলা কি? না মৃদুলার মতো নয় তো। দেখা যাক একটু এগিয়ে। ওমা, এ যে একেবারে অন্য লোক। ঘাগরা, ওড়না, পায়ে চুমকি-বসানো নাগরা। এ আবার কোথা থেকে এল।

"আদাব—"

"আদাব। আপনাকে চিনতে পারছি না তো। কোথায় থাকেন আপনি?"

"এইখানেই। বিজেনবাবুকে খুঁজছেন তো, তিনি ওই ওদিকের খদের ভিতর বসে আছেন।"

"খদের ভিতর? কি করছেন সেখানে?"

"টর্চ জেবলে কি যেন লিখছেন।"

অবাক হয়ে গেলাম শুনে। মেয়েটি মুচকি হেসে চলে গেল। কি অদ্ভুত পাতলা ওর ঘাগরা আর ওড়নার কাপড়। একেই মসলিন বলে না কি! মনে হচ্ছে যেন কাপড় নয়, জ্যোৎস্না গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। খদের ভিতর টর্চ জেবলে কি লিখছে বিজেনদা? বিজেনদার খেয়ালের আর সীমা

নেই। খদটা কোন্ দিকে? মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে হত। ঘাড় ফিরিয়ে আর তাকে দেখতে পেলাম না। কোথা গেল মেয়েটি! এখানে তো চারিদিকেই উঁচু নীচু। বিজেনদা কোথায় বসে আছে কে জানে। রাজু একটা খদের কথা বলছিল সেটা চিনি। সেইদিকেই যাওয়া যাক। সত্যি অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ। উথলে উঠেছে যেন রূপের জোয়ার। চাঁদ শুনেছি মরা উপগ্রহ...

এই যে কর্তা এখানেই বসে আছেন দেখছি। মনে করে' এসেছিলাম খুব ঝগড়া করব এমনভাবে লুকিয়ে চলে আসার জন্যে। কিন্তু পারছি না, কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে পাঞ্জাবী আর ঢিলা পায়জামায়. মাথার চুলগুলো এলোমেলো, বাতাসে উড়ছে, মনে হচ্ছে অদৃশ্য মুকুট পরানো আছে যেন মাথায়। টর্চ জ্বালা রয়েছে সত্যি, ঝুঁকে ঝুঁকে তারই আলোয় কি যেন লিখছে। কি কান্ড!

"আসতে পারি—?"

"হ্যাঁ, এইবার এস। আমার হয়ে গেছে—"

"কি লিখছ—?"

"পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ্ সেকের পয়েন্টস্গুলো। বইটা তো আনিনি। ভেবে ভেবে লিখলাম। হয়ে গেছে। চল একটা টিলার উপরে ওঠা যাক। লেখবার সুবিধে হবে বলে' এখানে নেবেছিলাম।"

উঠে এসে এক হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম যে, সেই মেয়েটির কথা বলতেই ভুলে গেলাম। মনে পড়লেও দ্বিতীয় কোন মেয়ের কথা তুলতাম না। মিছে কথা বলেছিলাম তখন, বিজেনদার কাছে আর কোনও মেয়েকে সহ্য করতে পারব না আমি। কারও ছায়া পর্যন্ত নয়। আস্তে আস্তে একটা টিলার উপর উঠলাম আমরা। বিজেনদা আমার কোমর তো ধরে' রইলই,

আমার হাতখানা তুলে জড়িয়ে দিলে নিজের গলায়। তারপর টিলায় উঠে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল নির্ণিমেষে, যেন আমাকে প্রথম দেখছে।

"কি দেখছ অমন করে?"

"তোমাকে। ভাবছি তোমাকে কেন্দ্র করেই আলোচনাটা শুরু করব—"

"চোখ অন্য দিকে ফেরাও, কি যে কর,—ভারি লজ্জা করছে আমার—"

"করুক। ফেরাব কি করে, তুমিই তো ধরে' রেখেছ। যাক্, ও সব বাজে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে ব্র্যাডলে সাহেবের বক্তব্যটা মন দিয়ে শোন। ব্র্যাডলে যা বলেছেন তাঁর এক কথায় মানে হচ্ছে, কবিতার প্রাণ কবিত্ব, আর কবিত্বের প্রাণ কবির অনুভূতি-ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রকাশ-ভঙ্গী। এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় যেখানে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাকেই কবিতা বলব, রসোত্তীর্ণ করে' এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় সাধন ছাড়া কবিতার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কবিতা হচ্ছে সৃষ্টি, স্রষ্টার ছাপও তাতে থাকা চাই—।"

"ব্র্যাডলে যে সাবজেক্ট্, সাব্স্টান্স আর ফর্ম নিয়ে কি সব বলেছে, তার মানে কি—"

"মানে খুব সরল। ব্র্যাডলে 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর উপমা দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখন সপ্তম স্বর্গে চড়ে আছি, স্বর্গ থেকে পতনের কথা ভাবতে রাজি নই। আমি তোমাকেই উপমা দেব। মিছে কথা হবে না, সত্যিই তুমি একটা কবিতা, মানুষ-কবির নয় বিধাতা-কবির—"

শুনতে কি যে চমৎকার লাগছে তবু রাগের ভান করে বললাম—"কি যা তা বলছ—"

"বাধা দিও না, শুনে যাও। বিধাতা-কবির এই যে কবিতাটি—এর সাবজেক্ট্ কি? নিরুপমা। সাবজেক্ট্

হচ্ছে কবিতার নাম। নিরুপমা নামে আরও অনেক মেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও তোমার মতো নয়। বিধাতা তোমার মধ্যে দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তার নাম নিরুপমা না হয়ে পারুল, বকুল, এমন কি খেঁদি পুঁটি হলেও সে কাব্যের মাধুর্য কমত না। সুতরাং নামটার সঙ্গে আসল কবিতাটির নিবিড় সম্পর্ক নেই, যতটুকু আছে তা আকস্মিক যোগাযোগ। মিলটন তাঁর কাব্যের নাম প্যারাডাইস লস্ট্ না দিয়ে ধর যদি দিতেন 'দি গ্রেট ফল' বা ওইরকম একটা কিছু, তাহলে তাঁর কাব্যের মর্যাদা কমত না। কিন্তু আর একটা মজা আছে, নামকরণ একবার হয়ে গেলে তখন কাব্যের সঙ্গে নাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় যে, কাব্যেরই একটা অঙ্গ বলে' মনে হয় তাকে। নিরুপমা বললেই তোমার চিত্রটা ফুটে ওঠে তোমার পরিচিতদের মনে। নূরজাহান আরো অনেক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু নূরজাহান বললে অন্য আর কাউকে বুঝিনা আমরা। নামের সঙ্গে কাব্যের এই সম্পর্কটির সুযোগ নেয় চোর লেখকরা। ভাল লেখকদের নামজাদা বইয়ের নামটা চুরি করে' ছেপে দেয় নিজেদের বইয়ের উপর। ভাবে নামের জোরে বই কাটবে। কিছুদিন কাটেও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটে পোকায়। আমি একজন মেথরাণীকে জানতাম, তার নাম ছিল নূরজাহান। প্রথম যখন নামটা শুনি একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু একবার চোখে দেখার পর—হো হো করে' হেসে উঠল বিজেনদা।

আমি চমকে উঠলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

"সুতরাং এবার বোধহয় বুঝেছ সাবজেক্ট্ অর্থাৎ নামের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কটা কি—"

"বুঝেছি। আর ফর্ম ?—"

"বলছি। ফর্মটা হচ্ছে বলবার কায়দা, প্রকাশভঙ্গী, বক্তব্যটাকে একটা বিশেষ ধরনে ব্যক্ত করা। কৃত্তিবাস

রামায়ণের গল্পটা বলছেন সরল ভাষায় পয়ার ছন্দে। ওই ভাষা আর ওই ছন্দ মিলে যা হয়েছে তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফর্ম। মাইকেল মধুসূদনও ওই রামায়ণের গল্পই লিখেছেন কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে শক্ত শক্ত গুরু-গম্ভীর কথা দিয়ে—ওইটে হল মাইকেলের কাব্যের ফর্ম। আবার ওই রামায়ণের গল্পই ভবভূতি লিখেছেন আলাদা ছাঁদে, আলাদা ভাষায়। তুলসীদাস লিখেছেন আর একরকম করে। বিধাতা-কবি এই নিরুপমা শীর্ষক কাব্যটিও প্রকাশ করেছেন একটি বিশেষ ফর্মের মাধ্যমে. সে ফর্মটি হচ্ছে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। তার শ্যামল রং. পানের মতো মুখ, ছোট্ট নাক, পুষ্ট অধর, কুন্দ দন্ত. কম্বু গ্রীবা. পীবর বক্ষ—”

মুখ চেপে ধরতে হল।

“কি আরম্ভ করেছ তুমি! ওরকম করতো উঠে যাব। ফর্ম বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এবার সাবস্‌টান্সের কথা বল—”

“তোমার সাবস্‌টান্স বিশ্লেষণ করলে কিছু মাংস. কিছু অস্থি. কিছু রক্ত, কিছু মেদ. কিছু মজ্জা—এই সব পাওয়া যাবে। যে কোন তরুণীর সাবস্‌টান্সও মোটামুটি এই। সেইজন্য শুধু সাবস্‌টান্স নিয়ে মাতামাতি করে যারা. তারা বেরসিক। পায়খানাও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়. প্রাসাদও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়, দেব-মন্দিরও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়। চুন ইঁট সুরকি সিমেণ্টই বড় কথা নয়. তা দিয়ে কি তৈরি হয়েছে সেইটেই হল আসল কথা। সুতরাং কাব্যে—শুধু কাব্যে কেন, যে কোনও সৃষ্টিতে—সাবস্‌টান্সের সঙ্গে ফর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা থেকে আর একটা আলাদা করা অসম্ভব। আলাদা করতে গেলেই কবিতা মারা যাবে। তোমাকে কেটে যদি তোমার অস্থি মাংস মেদ মজ্জা আলাদা করি তাহলে আর তুমি থাকবে না। কিন্তু এটাও মনে

রাখতে হবে যে, ফর্ম আর সাবস্‌টান্সের সমন্বয়ই কবিতা নয়। নিরুপমার ফোটো বা স্ট্যাচু যেমন নিরুপমা নয়। তার মধ্যে প্রাণের লীলা থাকা চাই। নিরুপমার চলনে বলনে হাসিতে ভ্রূভঙ্গে অপাঙ্গে অধরে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, তার চরিত্রে বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে যা বিকশিত হচ্ছে নানা বর্ণে—তাই নিরুপমা কবিতার আসল রূপ। দেহকে অবলম্বন করে অন্তরের রূপটা ফুটেছে বলেই দেহের কদর। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে রূপটাই মুখ্য। দেহটা নয়। পঙ্ককে আমরা সহ্য করি পঙ্কজিনীর জন্য। ক্যানভাসকে খাতির করি ছবির জন্য··..."

"খদের ভিতর বসে বসে এই সব লিখছিলে এতক্ষণ ধরে!"

"হ্যাঁ। এই সবই লিখছিলাম, কিন্তু তার ফর্ম আলাদা—"

"তার মানে?"

"কবিতা লিখছিলাম। গদ্য ছন্দে অবশ্য। শুনবে?"

"পড়—"

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল প্রকাণ্ড টর্চটা। ব্রিজেনদা পড়তে লাগল—

নিরুপমার উপমা নেই বলে অনেকে,
মানিনা সে কথা।
নিরুপমার উপমা আছে,
সে উপমা নিরুপমাই।

নিরুপমাকে রূপসী বলেছে কেউ কেউ,
কিন্তু তারা সবটা বলে নি,
কারণ তারা পুরো সত্যটাকে দেখে নি।
নিরুপমা একান্ত ভাবেই নিরুপমা,

নিরুপমা ছাড়া ও আর কিছু নয়,
কিছু হতে পারত না,
একথা না বললে সবটা বলা হয় না।
রূপসী অনেক আছে
কিন্তু সবাই নিরুপমা নয়।

রংটা যদি আর একটু ফর্সা হ'ত
নাকটা হ'ত যদি আর একটু টিকোলো,
কম-পুরু ঠোঁট দুটো হ'ত যদি,
চোখ দুটো আরও টানা-টানা হ'ত,
তাহলে হয়তো আরও রূপসী হ'ত সে
কিন্তু সে সেই নিরুপমা হ'ত না
যে আমার কল্পনাকে করেছে স্বপ্নাতুর,
চোখে পরিয়েছে মোহাঞ্জন,
রঙের পরশ লাগিয়েছে
জন্মজন্মান্তরের প্রহেলিকা-রহস্যে,

যে নিরুপমা
মহাকালকে বিলীন করতে পারে মুহূর্তে,
মুহূর্তকে প্রসারিত করতে পারে মহাকালে,
সেই শ্যামলী, ঠোঁট-পুরু নাক-ছোট নিরুপমা
বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি;
সে অবিসংবাদিতা,
অদ্বিতীয়া।
ওকেই আমি চেয়েছি
চিরকাল চাইব।

টর্চ নিবে গেল। পাশাপাশি বসে আছি দু'জনে। গলার কাছটা ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে চোখের কোণ থেকে

জল গড়িয়ে পড়বে এখ্খুনি, কিন্তু পড়ছে না।

হঠাৎ বিজেনদা বললে, "তুমি যখন খদের ওপার থেকে লুকিয়ে কথা কইছিলে তখন আমি এইটে লিখছিলাম।"

"আমি আবার কখন কথা কইলাম—"

"বাঃ বললে না, আমি যদি বলি শাহনশাহ্ আমি তোমার পূর্বজন্মের বেগম ফিরে এসেছি. চিনতে পারবে আমাকে—"

"না, আমি তো বলি নি।"

"মিথ্যুক কোথাকার—"

সেই ওড়না-পরা মেয়েটার ছবি ভেসে উঠল মনে। নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। না, বিজেনদার ভুলটা ভাঙাব না। ও মনে করুক যে আমিই এসেছিলাম। মুখের দিকে চেয়ে আছি নির্ণিমেষে—হতে পারে বই কি শাহনশাহ্ ছিল...কিন্তু না, আর এখানে বসে' থাকা নয়।

"অনেক রাত হয়ে গেছে, চল। মৃদুলা আমাকে আবার ফরমাস করেছে ভোরবেলা কিছু কুমুদ ফুল আনবার জন্যে—ওই দূরের পুকুরটা থেকে—"

"কুমুদ ফুল? কেন?"

"কি জানি—"

"এখনই চল না নিয়ে আসি গিয়ে। বেশী দূর তো নয়—"

'চল।'

তের

দ্বিজেনের কথা

"জোরে চালাও, আরো জোরে। ওই নক্ষত্রটা অস্ত যাবার আগে আমি আমার ছাতে গিয়ে বসতে চাই?"

মেঠো রাস্তায় প্রায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে নিমাই ডাক্তারের বাড়িতে এসে যখন পোঁছলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিমাই গাড়ি থেকে নেমেই ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইলে।

"না, এখনও অস্ত যায়নি। চল ওপরে চল।"

"কোন্ নক্ষত্রটা?"

"ওই যে বকুল গাছের মাথায় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। এখনই অস্ত যাবে। চল—"

"কি নাম ওটার?"

"লুব্ধক। ইংরেজি নাম সিরিয়াস। চল ছাতে যাই—"

গাড়িটা নিমাইয়ের চাকরের জিম্মায় রেখে ছাতে উঠলাম দু'জনে। পথে একটিও কথা হয়নি। আমি একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, নিমাই উত্তর দেয় নি। ছাতে চেয়ার পাতাই ছিল। চেয়ারে বসে প্রথমেই জিগ্যেস করলাম—"সুখেনদা কি বললে—"

নিমাই চুপ করে রইল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে' থেকে বাম তর্জনীটা দিয়ে বাঁদিকের গোঁফটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না, ওর গোঁফের দিকে চেয়ে কতক্ষণই বা বসে থাকা সম্ভব। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করাও যুক্তিযুক্ত মনে হল না। নিমাইয়ের আকাশমুখী দৃষ্টির দিকে চেয়ে মনে হল নিমাই ছাতে নেই, আকাশেই চলে গেছে। যখন ফিরে আসবে

তখন নিজেই উত্তর দেবে। লুব্ধক নক্ষত্রের দিকে আমিও মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। অদ্ভুত উজ্জ্বল নক্ষত্রটা সত্যি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি ওইটেই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমিও কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। নিমাইয়ের কথাতে আমার চমক ভাঙল, কতক্ষণ পরে জানি না। নিমাই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল একটা।

"আর কি ফেরবার উপায় আছে?"

"কোথা থেকে?"

"ফুলুর কবল থেকে।"

"কবল মনে হলে ফেরবার উপায় নিশ্চয় বার করতাম, কিন্তু ওটা কবল বলে মনে হয় নি আমার একবারও।"

"কি মনে হয়েছে—"

"তা বলা যাবে না। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, তুমি আমাকে এমনভাবে জেরা করবে জানলে আমি তোমার কাছে আসতাম না। তোমাকে যতটুকু বলেছি ততটুকু থেকেই তোমার বোঝা উচিত আমার মনের অবস্থাটা কি। আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি, তোমার উপহাসের খোরাক জোগাতে আসিনি। আসল কথাটা বল না। সুখেনদার কাছে পেড়েছিলে কথাটা? জাতিভেদের তর্কটা কোথায় গিয়ে ঠেকল শেষ পর্যন্ত।"

তবু নিমাই সুখেনদা প্রসঙ্গে কোন কথাই বললে না। একটু চুপ করে থেকে বললে—"তোমাকে নিয়ে উপহাস করবার সময় নেই আমার, আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তবে তোমার মধ্যেও একজন উপহাস-রসিক ব্যক্তি আছেন সেটা মনে রেখ কিন্তু। নিজেই শেষ পর্যন্ত তার খোরাক না হয়ে পড়, সেই কথাই আমি ভাবছি। ফেরবার উপায় যদি থাকে প্লীজ ব্যাক আউট। আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ

করেছি তা মনোহর কিন্তু ভয়ঙ্কর। তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি হয়েছি কারণ না-পাওয়ার যে কি দুঃখ তা আমি মর্মে মর্মে জানি। কিন্তু এর আর একটা দিকও যে আছে তা যদি তোমাকে না বলি তাহলে বন্ধুকৃত্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে"

"বল। ফিরে যাওয়ার তাড়া নেই আমার।"

"সিগারেট ধরাও তা'হলে—"

নক্ষত্রটার দিকে চট্ করে এক নজর চেয়ে নিমাই পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলে। আমাকে একটা সিগারেট দিলে, নিজে একটা নিলে। আমি সিগারেট ধরালাম, ও কিন্তু সিগারেটটার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে, তারপর ধরালে সেটা। ধরিয়েও চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। আমি নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলাম ওর অন্যমনস্কতা। লক্ষ্য করতে করতে আমিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলাম ফুলু এখন কি করছে। সে কখন কার সঙ্গে কোলকাতায় ফিরবে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাকে সাইড্কারে বসিয়ে গোপনে একটা চক্কোর দিয়ে আসবার সময় হবে কি না।

হঠাৎ নিমাই বললে—"অরুণার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন আমি মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। কলেজের এক ডিমন্স্ট্রেটারের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল, সেইখানেই আমি ওকে প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছিল। তখন ওর বয়স তের বা বড় জোর চৌদ্দ। বাঙালী মেয়ের মতো চেহারা নয়। নীল চোখ, লালচে রং, সোনালী চুল। শেলীর ছবি দেখেছিস্? অনেকটা সেই রকম। প্রথম দিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নিতান্ত পরিচিত লোককে

অনেকদিন পরে অচেনা লোকের ভিড়ে দেখতে পেলে, যেমন অবাক লাগে, আনন্দ হয়, আমার ঠিক তেমনি অবাক লেগেছিল, আনন্দ হয়েছিল। অরুণারও যে হয়েছিল তা তার চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝেছিলাম। পরে অরুণা আমাকে বলেওছিল সে কথা। প্রথম প্রথম আমাদের কোনও কথাই হয় নি। আমি কোন না কোন একটা ছুতো করে' রোজই ডিমনস্ট্রেটারের বাড়ি যেতাম, আর সে-ও নানা ছুতোয় আমার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করত। কথাবার্তা একটিও হ'ত না, অথচ সে-ও সব বুঝত, আমিও সব বুঝতাম। আমি তখন মনে করেছিলাম অরুণা বোধহয় ডিমনস্ট্রেটারের কোনও আত্মীয়া, কোলকাতায় পড়াশোনার জন্যে আছে। মেয়ে যে নয় তা বুঝেছিলাম। কারণ ডিমনস্ট্রেটার ভদ্রলোক বিয়েই করেন নি। চেহারার কিছুমাত্র মিল ছিল না, তাই বোন বলেও সন্দেহ হয় নি। ওসব নিয়ে মাথাই ঘামাই নি তখন। তাকে বিয়ে করতে হবে একথাও মনে হয় নি। তাকে রোজ কাছা-কাছি পাচ্ছি এতেই আমি ভরপুর হয়ে' ছিলাম। ডিমনস্ট্রেটার মশাই, কিম্বা তাঁর মা আমাদের মেলা-মেশাতে বাধাও দিতেন না তেমন। বোটানিকাল গার্ডেনে একদিন পিকনিক করতে গেলেন তাঁরা। আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন। সেইদিনই অরুণার সঙ্গে প্রথম কথা কইলাম। সেইদিনই অরুণা বললে, "আমরা পরশু চলে যাচ্ছি এখান থেকে।" "কোথা যাচ্ছ?"—প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বোধ হয় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বেরোয় নি, কারণ অরুণা প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিল। হেসে বললে, "জলপাইগুড়ি। ডক্টর রায় বদলি হয়ে গেছেন, শোনেন নি?" খবরটা আমি শুনিনি। খবরটা শুনে আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছিল তা ওর মুখের দর্পণে দেখলাম। ও হাসি মুখে চেয়েছিল আমার দিকে, দেখতে দেখতে ওর মুখটাও বিবর্ণ হয়ে

গেল। তারপর হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। তার দু' দিন পরেই চলে গেল ওরা—"

নিমাই সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মাথার চুলগুলো দু' হাতে মুঠো করে ধরে' কয়েক সেকেন্ড বসে রইল মাথা নীচু করে'। তারপর উঠে দাঁড়াল। সোজা চলে গেল ছাতের রেলিঙের কাছে। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। নক্ষত্রটা তখন বকুল গাছের আড়ালে চলে গেছে।

"চিঠিপত্র চলেছিল নিশ্চয়।"

আমি একটু ইতস্তত করে' প্রশ্নটা করেই ফেললাম অবশেষে। আমার কৌতূহল হয়েছিল বলে' নয়, ওকে আকাশ থেকে মাটিতে টেনে আনবার জন্যে। ফল হল। নিমাই রেলিঙের ধার থেকে সরে এসে চেয়ারে বসল।

"চলেছিল। একটা দু'টো নয়, অনেক। কিন্তু মাত্র তিন মাস। ওর চিঠি থেকেই জেনেছিলাম যে, ও ডক্টর রায়ের আপনার লোক নয়। ওর মা ওরাঁও, বাপ এক মিলিটারি সাহেব। অবৈধ রিরংসার ফলে গত যুদ্ধের সময় জন্ম হয়েছিল ওর। যথাসময়ে সাহেব দেশে ফিরে গেলেন যথারীতি। ডক্টর রায় তখন রাঁচিতে। সাহেবের সঙ্গে ডক্টর রায়ের আলাপ ছিল, সেই সূত্রে ওরাঁও মেয়েটি এসে ডক্টর রায়ের কাছে আশ্রয় নিলে। আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, কারণ নিজেদের সমাজে ওর স্থান হয় নি। বেশী দিন বাঁচেও নি। অরুণা হবার মাস ছয়েক পরেই মারা যায়। সেই থেকে অরুণাকে ডক্টর রায়ই মানুষ করছেন।"

নিমাই থেমে গেল।

"তারপর?"

"তিন মাস পরে অরুণা হঠাৎ চিঠি লেখা বন্ধ করে' দিলে।"

নিমাই আবার চুপ করে' গেল। চুপ করে' রইল অনেকক্ষণ।

"তারপর ?"

"তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।"

"হারিয়ে গেল মানে ?"

"মানে তার আর কোন খোঁজ পেলাম না। আমার তখন পরীক্ষা সামনে, তবু আমি জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। শুনলাম জলপাইগুড়ি থেকেও ডাক্তার রায় চলে গেছেন। কেউ বললে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটনায় গেছেন. কেউ বললে কটকে গেছেন। দু' একজন মজঃফরপুরেরও নাম করেছিল। তিন জায়গাতেই গেলাম আমি, কিন্তু আর তাদের নাগাল পেলাম না।"

"তারপর ?"

নিমাই আবার চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ।

তারপর হঠাৎ হেসে বললে--"তারপর ফেল করলাম। একবার নয়, দু'বার। বকুনি দেবার মতো হিতৈষী কেউ ছিল না আমার। ব্যাংকে ছিল বাবার সঞ্চিত অর্থ। ব্যাংকের অ্যাকাউণ্টেণ্ট নরেনবাবু ছিলেন আমার পিতৃ-বন্ধু। তিনি একদিন সস্নেহে ভর্ৎসনা করলেন একটু। তাঁর ভর্ৎসনাটা নয়, স্নেহটা কাবু করে' ফেললে আমাকে। এখন মনে হয় সেই সময়টা যদি পড়াশোনায় না দিতে অরুণার খোঁজ করতাম তাহলে হয়তো তাকে ধরতে পারতাম। আই কার্স দ্যাট নরেনবাবু নাউ। ধরবার অনেক পথ ছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারতাম অন্তত একটা। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না, বসে' বসে' অ্যানাটমি মুখস্ত করতে লাগলাম খালি। অরুণাকে কিন্তু আমি ভুলিনি। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন সূর্যের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অরুণার স্মৃতিও তেমনিভাবে আমার মনে আঁকা ছিল। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন বিশ্বাস থাকে যে সূর্য আবার

উঠবে, আমার মনেও তেমনি বিশ্বাস ছিল যে, অরুণাকে আবার পাব। এখনও আছে।..."

আবার উঠে পড়ল নিমাই, আবার রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, আবার চেয়ে রইল লুব্ধকের দিকে। লুব্ধক তখন আরও নেবে গেছে, বকুল গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল—"এতকাল আমরা জানতাম না যে, পৃথিবীই ঘোরে; নক্ষত্র ঠিক থাকে। আমরাই দূরে সরে' যাই বলে মনে হয় নক্ষত্র বুঝি অস্ত যাচ্ছে। নক্ষত্র অস্ত যায় না!"

"অরুণার কথা বল—"

"অরুণাকে খুঁজে পেলাম না। পড়াতেই লাগলাম। এম-বি পাশ করে' বিলেত চলে গেলাম। যতদিন টাকায় কুলিয়ে ছিল বিলেতেই ছিলাম। গোটা তিনেক ডিগ্রী যখন জোগাড় হ'ল, জার্মানি যাব কি না যখন ভাবছি তখন হঠাৎ ব্যাংক খবর দিলে টাকা ফুরিয়েছে। ফিরে আসতে হল। যখন ফিরে এলাম তখন আমি কপর্দকহীন। অরুণাকে কিন্তু ভুলিনি। যদিও আর খোঁজবারও চেষ্টা করিনি তাকে। মনে মনে একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজেকে তার উপযুক্ত করে' তোলা, সে যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তখন আমাকে পেয়ে যেন গৌরব অনুভব করে। বিলেতে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিলাম, অরুণাই ছিল প্রেরণা।"

আবার চুপ করল নিমাই। সিগারেট ধরাল একটা। দু'চার টান খেয়ে শুরু করল আবার।

"আমি যখন ফিরলাম তখন ব্যাংক ব্যালান্স নিল্। সুতারং চাকরির চেষ্টা করতে হল। ছেলেবেলায় একবার স্বদেশীর দলে যোগ দিয়েছিলাম বলে' সরকারের ব্ল্যাকবুকে

নাম উঠেছিল। সরকারী চাকরি জুটল না। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে, মেসের খরচ চালাতে পারি না। এমন সময় আমার এক বন্ধু এসে চাকরির খবর দিলে। একটা বিজ্ঞাপন দেখালে এসে। সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ে একটি শয্যাশায়ী রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্যে ডাক্তার দরকার একজন। মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকা, তাছাড়া খাবার খরচ এবং থাকবার বাড়ি পাওয়া যাবে। বিলিতি ডিগ্রি থাকলে ভাল হয়। দিলাম দরখাস্ত করে'। পোস্টবক্সে ঠিকানা দেওয়া ছিল। দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই পেয়ে গেলাম চাকরিটা। দেখলাম আমাকে বাহাল করছেন একজন সাহেব,—মিস্টার হডসন, বোম্বাই থেকে। একটু আশ্চর্য হলাম। কে ইনি? যাই হোক, অভাবের তাড়নায় বেশী গবেষণা করবার সময় ছিল না। সোজা চলে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম জানিস?"

"কি—"

"রোগী নয়, রোগিনী, আর সে রোগিনী অন্য কেউ নয়, অরুণা। টি বি হয়েছে। অরুণার সঙ্গে দেখা হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু তাকে এ ভাবে দেখব তা ভাবি নি। অরুণাও দেখবামাত্র আমাকে চিনতে পারলে। তার বড় বড় নীল চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু হাসিটি দেখলাম ম্লান হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে, নিমাইবাবু, আপনি এতদিনে এলেন। কতদিন যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছি মনে মনে। আমি জানতাম আপনি আসবেন। যাক, শেষ সময় তবু দেখাটা হল। দেখলাম, চোখের কোণে জল টলমল করছে। পরীক্ষা করে দেখলাম তাকে, এক্স-রে প্লেট দেখলাম, সব রিপোর্ট পড়লাম। আশা হ'ল বেঁচে যেতেও পারে। বললাম, ভয় কি। তোমার সাংঘাতিক তো কিছু হয় নি। ভাল হয়ে যাবে। সে চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ, চোখের

কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, না, আমি আর বাঁচব না। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর করবেন না!

"কেন?"

"বেঁচে আমার সুখ নেই"

আমি মনে মনে বললাম, বাঁচাবই তোমাকে।

তারপর তার ইতিহাস শুনলাম।

নিমাই উঠে দাঁড়াল আবার। আবার চলে গেল রেলিঙের ধারে। লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। অস্ত হয় তো যায় নি ঠিক, কিন্তু গাছপালার আড়ালে এত নেবে গেছে যে আর দেখা যাচ্ছে না। নিমাই কিন্তু বললে, "এখনও দেখা যাচ্ছে। তুই দেখতে পাচ্ছিস—?"

"না।"

"এদিকে সরে আয়। ওই যে—"

উঠতে হল।

"কই?—"

"ওই যে—"

খুব ঝুঁকে নিমাই দেখতে লাগল, আমারও ঘাড়টা ধরে যতদূর নোয়ানো সম্ভব নুইয়ে জিগ্যেস করলে, "এবার দেখতে পাচ্ছিস? ওই যে দপ্ দপ্ করে' জ্বলছে—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুই অন্ধ—"

আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। একটু পরে নিমাইও এল।

এসেই শুরু করল—"ডাক্তার রায় অরুণার বিয়ে দিয়েছিলেন এক সাঁওতাল খৃষ্টানের সঙ্গে। সাম্ মিস্টার কচ্ছপ। সে-ও ডাক্তার। অরুণার মা টি বি-তে মারা গেছেন জেনেও লোকটা অরুণাকে বিয়ে করেছিল।

বিয়ের কিছুদিন পরে ওদেরও টি বি হল। অরুণা আর তার স্বামী দুজনেরই। অরুণার বাবা, মানে সেই কর্নেল সাহেব একেবারে বিবেক-বুদ্ধি-বিবর্জিত লোক ছিলেন না। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের ফলে তিনি যখন জানলেন যে তাঁর অবৈধ প্রণয়ের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে—তখন তার নামে বেশ একটা মোটা টাকা তিনি বোম্বাইয়ের এক ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন। বোম্বাইয়ে তাঁর বন্ধু মিস্টার হডসন ব্যবসায় উপলক্ষে থাকতেন, তাঁরই জিম্মায় টাকাগুলো দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, অরুণার যখনই দরকার হবে তখনই তাকে এ টাকা যেন দেওয়া হয়। ডাক্তার রায়কেও এ কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। ডাক্তার রায় এ টাকা স্পর্শ করেন নি। অরুণার সমস্ত খরচ তিনিই বহন করতেন। তাকে কন্যাবৎ পালন করেছিলেন তিনি। দেবতুল্য লোক ছিলেন ডাক্তার রায়। অরুণার সঙ্গে কচ্ছপের যখন বিয়ে হয়ে গেল, আর বিয়ের পর দুজনেই যখন যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখনই দরকার হ'ল টাকাটার। ডাক্তার রায় ডাক্তার কচ্ছপকে বললেন, অরুণার যে টাকা আছে তা দিয়ে তোমরা কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় অনায়াসেই একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে বাস করতে পার। তিনিই সন্ধান করে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে ওই বাড়িটা তাদের কিনে দিয়েছিলেন।" নিমাই আবার চুপ করল।

মনে হল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার রায় কোথায় থাকেন?"

"সাউথ ইণ্ডিয়ায়। কিছুদিন হল তিনিও মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি একবার। অরুণার এই ইতিহাস তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। অরুণা আমাকে কিছু বলে নি।"

"তার যে বিয়ে হয়েছিল, একথাও বলে নি?"

"না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—"না, বলেনি। নোট দিস্।"

"তুই কিছু জিগ্যেস করিস নি?"

"করেছিলাম। কি করে সে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে এসে হাজির হল, নার্সের মাইনে, ডাক্তারের মাইনে, ওষুধ-পত্রের খরচ, খাওয়ার খরচ কি করে চলছে এসব জিগ্যেস করেছিলাম বইকি। সে উত্তরে বলেছিল, আমি কিছু জানি না, বাবা সব ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার রায়কে অরুণা বাবা বলে ডাকত। তার কাছেই আমি ডাক্তার রায়ের ঠিকানাও পেয়েছিলাম।"

"তারপর?"

নিমাই কোন উত্তর দিলে না। দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ।

"অরুণার স্বামী ডাক্তার কচ্ছপ মাস ছয়েক আগে মারা গিয়েছিলেন। একথা আমি জানতামই না। নার্স বা চাকররাও জানত না, কারণ তারাও আমার আসার ঠিক মাসখানেক আগেই বাহাল হয়েছিল। ডাক্তার কচ্ছপের সময় যে নার্স, চাকর ছিল তারা তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই চলে যায়। কেন যায় তা পরে বুঝেছি, তখন বুঝতে পারিনি। ডাক্তার কচ্ছপ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন অরুণার জন্যে কোনও ডাক্তার দরকার হয় নি। তিনি নিজেই নিজের এবং অরুণার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরই ডাক্তারের প্রয়োজন হল, মিস্টার হডসন তখন আমাকে পাঠালেন। আমি এসব খবর পরে শুনেছি, অরুণা আমাকে কিছুই বলেনি।"

নিমাই হঠাৎ উঠে আবার আলসেটার কাছে চলে' গেল। খুব ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

নিমাই ফিরে এসে বললে—"খুব উচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় যদি দাঁড়াতে পারতাম তাহলে ওটাকে এখনও দেখতে পেতাম। কাল আবার পাব।"

"তারপর কি হল বল।"

"তারপর কি হল তা বলবার আগে আমি তোমাকে আমার তখনকার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে অনুরোধ করছি। কল্পনা করতে পারা শক্ত, তবু চেষ্টা কর। যে অরুণার কথা আমার মনে তীরের মতো গেঁথেছিল এতদিন ধরে, যাকে আমি একদিন না একদিন পাবোই জানতাম, সেই অরুণাকে যখন আমি এমন অবস্থায় পেলাম যে তার জীবনমরণ নির্ভর করছে আমার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর, তখন আমার একমাত্র কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার বিস্তারিত বর্ণনা আশা করি নিষ্প্রয়োজন। দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, আমি একাই চিকিৎসা-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করলাম। টেলিগ্রাম করে' প্রায় তিন চারশো টাকার বই-ই আনিয়ে ফেললাম। যত রকম ওষুধ, যত রকম খাবার, যত রকম ইন্‌জেকশন, সুলভ, দুর্লভ যত রকম যা কিছু সমস্ত সংগ্রহ করেছিলাম তার জন্যে। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। অরুণা বাঁচল না, তাকে বাঁচতে দিলে না।"

"কে—"

"তার স্বামী। ডাক্তার কচ্ছপ—"

"কি রকম—"

আমি ইজি চেয়ারে ঠেশ দিয়েছিলাম। উঠে বসলাম।

নিমাই বললে, "আমি প্রথম বুঝতে পারতাম না অরুণার ওজন বাড়ছে না কেন। ভাল ভাল খাবার তাকে প্রচুর খাওয়ানো হ'ত, কিছু ওজন বাড়া উচিত ছিল, কিন্তু বাড়ছিল না, বরং কমছিল।

আমি নার্সকে জিগ্যেস করতাম—ঠিক খায় তো।

আমার মন যদিও সদাসর্বদা অরুণাময় হ'য়ে থাকত কিন্তু আমি নিজে তার কাছে পারতপক্ষে থাকতাম না। আমি কাছে থাকলে সে বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ত, একদিন আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, আমি কিছুতে আর ছাড়াতে পারি না। যক্ষ্মারোগের ওটা একটা বড় লক্ষণ। তারা প্রায় কামুক হয়। আমি পণ করেছিলাম তাকে বাঁচাব, তাই যথাসাধ্য তার কাছ থেকে সরে থাকতাম। নার্সই তাকে ওষুধ খাওয়াতো, খাবার খাওয়াতো। আমার প্রশ্নের উত্তরে নার্স বললে, ''খানতো উনি সব, কিন্তু বমি করে ফেলেন বাথরুমে গিয়ে।" ''বমি করে' ফেলেন? কেন?" নার্স চুপ করে রইল। তারপর নার্স বললে, "কেন তা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। খাবার ঠিক পরেই জানলার দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, জানলার সামনেই যে শ্যাওড়া গাছটা আছে সেই দিকে। তারপরই কেমন যেন হয়ে যান, বাথরুমে ঢুকে পড়েন, তারপরই বমির শব্দ শুনতে পাই।" বললাম, "তুমি একথা আমাকে বলনি কেন?" সে ভয়ে ভয়ে বললে, ''উনি মানা করেছিলেন।" নার্সকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলাম। তারপর অরুণাকে জিগ্যেস করলাম, "তোমার বমি হয়ে যায় একথা আমাকে বলনি কেন?" অরুণা চুপ করে' রইল। দেখলাম তার চোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, "আজ তোমাকে আমার সামনে খেতে হবে। খাওয়ার পর তোমাকে একটা ওষুধও দেব যাতে বমি না হয়। তোমার যা অসুখ হয়েছে তাতে খাওয়াই হোল আসল জিনিস। ভাল ভাল খাবার খেয়ে যদি হজম করতে পার তাহলে দু'দিনে সেরে উঠবে। খাওয়া আর বিশ্রাম এই দুটিই হল আসল জিনিস।" অরুণা চুপ করে রইল। তখন রাত খুব বেশী হয় নি। অরুণাকে সামনে খাবার খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে আমি পাশের ঘরে এসে বই ওলটাচ্ছিলাম। বার করবার চেষ্টা করছিলাম বমির জন্য

আর কি কি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। অরুণার পাশের ঘরেই থাকতাম আমি। হঠাৎ শুনলাম মোটা গলায় কে যেন বলে উঠল—"গলায় আঙ্গুল দাও। দাও—"

...পরমুহূর্তেই বমি করার শব্দ পেয়ে ছুটে গেলাম। দেখতে পেলাম সাদা-কোট-প্যান্ট-পরা একটা লম্বা কালো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলার সামনে। আমাকে দেখেই সরে গেল। মিলিয়ে গেল। ঘরের মেজে দেখি বমিতে ভেসে যাচ্ছে। অরুণা বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে। আমি অরুণাকে বিছানায় শুইয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। জানলার কাছে কে এসেছিল, কেন এসেছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরই পেলাম না তখন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, পাল্স-রেট হানড্রেড এণ্ড সিক্স্টি। গোণা যাচ্ছে না এ রকম অবস্থা। গোটা দুই ইন্জেকশন দেবার পর অনেক কষ্টে সামলাল। নার্সকে বসিয়ে আমি উঠে যাচ্ছিলাম, অরুণা নার্সের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি যাও।" নার্স উঠে গেল। অরুণা তখন আমাকে বললে, "আপনি যাবেন না, আপনি বসুন। আর একটু সরে' আসুন না এদিকে। আপনি কাছে বসে থাকলেই আমি ভাল হয়ে যাব। ওষুধ বিষুধ লাগবে না। আপনি দূরে দূরে সরে থাকেন কেন। আর একটু কাছে এসে বসুন না!" নিজেই সরে এল আমার কাছে। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কি বলব, কি করব, মাথাতেই এল না খানিকক্ষণ। হঠাৎ অনুভব করলাম অরুণা কাঁদছে। তার চোখের জলে আমার কামিজ ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ অরুণাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে সেই কালো লোকটার কথা মন থেকে একেবারে সরেই গিয়েছিল। কথাটা পরে ভেবে খুব আশ্চর্য হয়েছি। অত বড় একটা ঘটনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য। মেঘের

আড়ালে সূর্য চন্দ্র যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি। হঠাৎ কিন্তু মনে পড়ল আবার। অরুণাকে জিগ্যেস করলাম—"একটু আগে কার সঙ্গে কথা কইছিলে? কেউ এসেছিল কি?"

"কই, কেউ না তো। আপনি আর একটু সরে আসুন না।" দু'হাত দিয়ে আমাকে আরও জোরে জাপটে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি উঠে পড়লাম।

"ঘুমোও। আমি পাশের ঘরেই আছি। নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে বরং এসে একটু হাওয়া করুক তোমাকে—"

"না নার্সকে আসতে হবে না। কেউ ঘরে থাকলে ঘুম হয় না।"

"তাহলে আমাকে থাকতে বলছ কেন?"

"জেগে থাকব বলে। সমস্ত রাত জেগে থাকব।"

"না, ঘুমোও—"

চলে গেলাম। মনকে স্তোক দিলাম যা শুনেছি বা যা দেখেছি তা আমার মনের ভুল। সাহেবী পোশাক পরা কাফ্রির মতো চেহারা, এ রকম লোক তো এ অঞ্চলে চোখেই পড়েনি কখনও। কোথা থেকে আসবে ওরকম লোক। এলেও গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে বলবে কেন। সকালেই কিন্তু ভুল ভাঙল। অরুণার পুষ্টির জন্য যত রকম খাবারের আয়োজন আমি করেছিলাম সকালে উঠে দেখি তার কিছু নেই। ছত্রিশটা মুরগী ছিল, প্রত্যেকটির গলা মোচড়ানো। শুধু গলা মোচড়ানো নয়, প্রত্যেকটি ছিন্ন ভিন্ন করা। চারটে বড় বড় ছাগল ছিল দুধের জন্য, সকালে দেখা গেল চারটেই মরে' পড়ে আছে। ভাঁড়ারের সমস্ত খাবার চারদিকে ছড়ানো, ডিমগুলো ভেঙে চুরমার, হর্লিকসের শিশি, ওভালটিন, মাখন, চীজ, কলা, কমলা-লেবু, চাল, ডাল, তরকারি, ওষুধপত্র সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে কে

যেন ফেলে দিয়েছে চারদিকে। আমার ব্যাগটা পর্যন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। চাকর আর বাবুর্চি এসে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে' গেল। নার্সও যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তাকে অনেক অনুরোধ করাতে সে থেকে গেল। আমি যে কি করব ভেবে পেলাম না। প্রথমেই মনে হল, অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্যের জোগাড় করতে না পারলে সকলকেই অনাহারে থাকতে হবে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বাজার বেশ খানিকটা দূরে। অরুণাকে গিয়ে বললাম, ‘‘এখানে কি কোন বন্যজন্তুর উপদ্রব হয়েছে ইতিপূর্বে?”

'না। কেন বলুন তো-

বললাম। শুনে সে চুপ করে রইল। দেখলাম, তার চোখে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ভাবলাম, অরুণার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে' কোন লাভ নেই। ভয় পেলে অসুখ বেড়ে যাবে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ আর না তোলাই ভাল।

ঠিক করলাম নিজেই বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র সব কিনে নিয়ে আসি, আর পুলিশকেও একটা খবর দিয়ে আসি। তখনও আমি মনকে স্তোক দিচ্ছি যে কোনও বদমাইস লোক হয়তো এসে এই সব করেছে। নার্সকে বলে' গেলাম তুমি অরুণার কাছে থাকো। আমি জিনিস-পত্র সব কিনে আনি গিয়ে। পুলিশেও একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা রাঁধুনীও জোগাড় করতে হবে। আমার ফেরার কথা দুপুরে। কিন্তু যখন ফিরলাম তখন রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। সেদিনও আজকের মতো পূর্ণিমা রাত্রি ছিল। আমার ফিরতে দেরি হল একটা অদ্ভুত কারণে। জিনিসপত্র সব কিনে একটা গরুর গাড়িতে সেগুলো বোঝাই করে' থানায় গেলাম। দারোগা-বাবু ছিলেন না, তাঁর অপেক্ষায় ঘণ্টা দুই বসতে হল।

তিনি এসে সব শুনে বললেন, কোন বদমাইসেরই কান্ড। যাই হোক কোন ভয় নেই, তিনি এসে এনকোয়্যারি করে' সব ঠিক করে' দেবেন। মাল বোঝাই গরুর গাড়িটাতে চেপে বসলাম। খানিকক্ষণ বেশ এলাম। বেশ বড় বড় জোয়ান বলদ, মনে হল রাত আটটা নাগাদ পেঁাছে যাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে আমরা প্রকান্ড একটা মাঠে এসে পড়লাম। মাঠে এসে গরু দুটো হঠাৎ কি যেন দেখে ভড়কে গেল, তারপর ডান দিকে ফিরে ছুটতে লাগল। সে কি ছুট! গাড়োয়ান প্রাণপণে রাশ টেনে ধরেছে, কিন্তু তাদের থামাতে পারছে না। হঠাৎ রাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেল। উদ্দাম বেগে ছুটতে শুরু করল তখন গরু দুটো। ছুটতে ছুটতে শেষে হুড়মুড় করে' নেবে পড়ল একটা নদীতে, পা পর্যন্ত কাদায় পুঁতে গেল তাদের, আমার জিনিসপত্র কিছু রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিল, বাকীটা পড়ল নদীর জলে। আমি লাফিয়ে নেবে পড়লাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফিরলাম। ফিরে দেখি চারদিকে নিশুতি। নার্সের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার, সাড়া পেলাম না। সন্তর্পণে অরুণার ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম অরুণা ঘুমুচ্ছে। তাকে আর জাগাবার চেষ্টা করলাম না। ভাবলাম নার্সও হয়তো নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু রাগ হল, অরুণার কাছেই তার থাকবার কথা। আচ্ছা, দায়িত্বজ্ঞানহীন তো! তখনও বুঝতে পারি নি সেও মারা গেছে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। একবার ইচ্ছে হল অরুণার কাছেই জেগে বসে' থাকি। যদি থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না হয়তো। কিন্তু অরুণার ভালোর জন্যে তার কাছ থেকে বরাবরই সরে' ছিলাম, অত্যন্ত কষ্ট করে,' নিরতিশয় আত্মনিগ্রহ করে' সরে' ছিলাম, সেদিনও সরে' গেলাম। নিজের ঘরে গিয়ে

বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ চেষ্টা করেছিলাম জেগে থাকতে। কিন্তু পারি নি। ঘুম ভাঙল আবার সেই গলার আওয়াজে। ধড়মড় করে' বিছানায় উঠে বসলাম। শুনলাম পাশের ঘরে মোটা গলায় কে যেন গুণছে—"চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ। থামছ কেন, আরও কর—তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ—" বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখলাম সেই কালো লম্বা লোকটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার সামনে অরুণা উঠ-বোস করছে! রেগুলার উঠ-বোস করছে।

"কে—কে—কে তুমি—" চীৎকার করে ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল লোকটা। অরুণা দেখি মেজেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। নাড়ি দেখে বুঝলাম তার শেষ সময় উপস্থিত। পাঁজা-কোলা করে' তুলে বিছানায় শোয়ালাম তাকে। আমার দিকে চাইলে একবার অরুণা, তারপর হাসলে একটু। বললে, "আপনাকে এ জীবনে পেলাম না। কিন্তু আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে' থাকব।"

আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। তার রক্তাক্ত অধরে চুমো খেলাম একটা।

"কোথায় অপেক্ষা করে' থাকবে অরুণা?"

"ওইখানে—"

আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে লুব্ধক জ্বলছে দপ্ দপ্ করে'।

"ওই নক্ষত্রে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে?—"

"হ্যাঁ, ওই নক্ষত্রে অপেক্ষা করব। আপনি আসবেন ওখানেই।"

ওই তার শেষ কথা। একটু পরেই সে মারা গেল।

অনর্গল কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিমাই।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে' শুয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। আমি ত চুপ করে ছিলামই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর নিমাই উঠে বসল, সিগারেট ধরাল একটা। আমাকেও একটা দিলে। তারপর বলল, "তোমাকে এ গল্প শোনালাম একটি কারণে। ফাঁদে পা দেবার আগে ফাঁদের স্বরূপটা জেনে নাও। বিবাহিতা অরুণা স্বামীকে ভালবাসে নি, আমাকে ভালবেসেছিল। এখনও ভালবাসে। অথচ তার স্বামী তার জন্যে না করেছিল কি? বাংলা ভাষা শিখেছিল, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছিল, যক্ষ্মারোগ বরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ছিনিয়েও নিয়ে গেল, কিন্তু অরুণা তবু তাকে ভালবাসে নি। আমি জানি ভালবাসে নি। তুমি আজ যে আগ্রহ নিয়ে ফুলুকে বিয়ে করতে চাইছ, ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে কচ্ছপও একদিন অরুণাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অরুণাকে চিনত না। তুমি ফুলুকে ঠিক চিনেছ তো?"

"নিশ্চয় চিনেছি। সুখেনদা কি বললে তাই বল।"

"আমি যখন সুখেনকে অনুরোধ করেছি তখন তাকে রাজি হতেই হবে। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই নেই, যা নিয়ে দরকার তা সুখেনের এলাকায় নয়, তোমার এলাকায়। আমি নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতা থেকে সে এলাকায় কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলাম শুধু।"

জ্যোৎনায় আকাশ-পৃথিবী স্বপ্নাতুর। আকাশের প্রেম যেন জ্যোৎস্না হয়ে এসে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে একা চলেছি। মোটর-বাইকের আওয়াজও মোলায়েম হয়ে এসেছে এই জ্যোৎস্নায়। কেবলই মনে হচ্ছে—আহা ফুলু যদি এ সময়ে পাশে থাকত। নিমাইয়ের গল্পটা মনে পড়ছে মাঝে মাঝে। অদ্ভুত গল্প, কিন্তু গল্প। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতোই এ গল্পও যুগপৎ সত্য

এবং মিথ্যা। আরব্য উপন্যাসের গল্প যেমন আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, নিমাইয়ের গল্পও করবে না। নিমাইয়ের অভিজ্ঞতা নিমাইয়ের কাছেই সত্য, সে নক্ষত্র-লোকে তার প্রিয়ার সন্ধান করুক। আমি চাইব আমার ফুলুকে। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও চিরকাল চাইব।

চৌদ্দ

অবনীশের কথা

কফি খাওয়ার পর সত্যিই আমরা দুজনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। যে সব জটিলতা, যে সব আবছা-স্বপ্ন, আমার মনকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল তা যেন সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো কেটে গেল। শুধু তাই নয়, মনটা শিশুর মতো যেন স্বচ্ছ সজীব পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ সেই মন হয়ে গেল যে মন সাগ্রহে রূপকথা শোনে, যে মন অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। বাইরের যে সব ঝামেলা সুখেনের মনকে বারবার বিক্ষিপ্ত করে' গল্পের রস-ভঙ্গ করছিল সে সব ঝামেলাও অন্তর্ধান করেছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির গভীরতার মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে পরে 'চিপ্ চিপ্ চিপ্' করে' সেই পোকাটা ডাকছিল বটে, কিন্তু তা সুখেনের মনকে বিক্ষিপ্ত করছিল না। পোকার ডাকে বিচলিত হওয়ার মতো মনই নয় সুখেন্দুর। সে তাকিয়াটা ঠেশ দিয়ে বেশ জুৎ করে' বসেছিল, আর বেশ জুৎ করেই শুরু করেছিল গল্পটা।

"আমি যখন শুয়োরের দাঁতটা নিয়ে এলাম আমাদের পূর্ণ-পুরুত তখন বাইরে অলক্ষ্মীর পুজো নিয়ে ব্যস্ত!"

"অলক্ষ্মীর?"

"হ্যাঁ। লক্ষ্মীপুজোর আগে অলক্ষ্মী-বিদায় করতে হয়। আমাদের দেশ, ভদ্র দেশ তো, বিদায় করবার সময়ও পুজো করে' তবে বিদায় করে। অনেকে বলে ভয়ে পুজো করে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না, আমার মনে হয় ওটা

আমাদের ভদ্রতা। আমরা কাউকেই কষ্ট দিতে পারি না, এমন কি অলক্ষ্মীকেও নয়।..."

"লক্ষ্মীর মূর্তি দেখেছি। কিন্তু অলক্ষ্মীর মূর্তিতো দেখিনি কখনও। সে আবার কেমন—"

"ভয়ঙ্কর। কালো রং, কালো কাপড় পরা, সর্বাঙ্গ তেল চুকচুকে, এলো-চুল, বড় বড় দাঁত, এক হাতে ছাই, আর এক হাতে ঝাঁটা। বাহন গাধা, গায়ে লোহার গয়না, ভয়ানক কুরূপা, ভয়ানক ঝগড়াটে, বাস কুৎসিত স্থানে।"

"এর পূজো হয়?"

"হয়। অলক্ষ্মী-বিদায় না করলে লক্ষ্মী আসেন না। নিমাই অলক্ষ্মী বিদায় করতে পারে নি, তাই ওর জীবনে লক্ষ্মী আর এল না। এ জন্মে আসবেও না বোধ হয়।..."

নিমাই ডাক্তারের কথা জানতাম না আমি।

"কেন, কি হয়েছে নিমাইয়ের।"

"সে নিমাইয়ের মুখ থেকেই শুন' একদিন। আমি বলতে পারব না—"

থেমে গেল সুখেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সোজা হয়ে চাপটালি খেয়ে বসে, ডান হাঁটুটা নাচাতে লাগল অকারণে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে। যখন কথা কইল তখনও অন্যমনস্ক। নিমাইয়ের কথা আমার কাছে গোপন করতে চাইল কিন্তু অস্ফুটকণ্ঠ যা বললে তা নিমাইয়েরই কথা।

"নিমাই ছেলে খুব ভাল। কিন্তু কি যে ওর কপাল, অলক্ষ্মী ভর করে' আছে ওর ওপর। দূরে সরে গেছে, ছেড়েও যাবে, কিন্তু কষ্ট দিচ্ছে।"

আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে' থেকে সুখেন যা ব্যক্ত করলে বুঝলাম সেটা অলক্ষ্মী-বিদায় সম্বন্ধে সুখেনের থিওরি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, প্রায় সব জিনিস সম্বন্ধেই আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একটা

'থিওরি' খাড়া করে' রেখেছি মনে মনে। ঘটি কেন গোল থেকে আরম্ভ করে' পৃথিবী কেন গোল পর্যন্ত, কোন বিষয় বাদ নেই।

সুখেন বললে—"আসল কথা কি জানিস আমাদের চরিত্রে যা কিছু মন্দ জিনিস আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে বেস্ এলিমেন্ট্স্ সেগুলো দূর না হলে লক্ষ্মী আসতে পারেন না—যিনি গৌরবর্ণা, সুরূপা, সর্বালঙ্কার-সমন্বিতা—যিনি পদ্মহস্তা পদ্মাসনা, তিনি নোংরামির মধ্যে এসে কি স্বস্তি পান কখনও? ভুল করে এসেও পড়েন যদি বেশীক্ষণ টিঁকতে পারেন না। দেখিস না এক একটা লোক হঠাৎ বড়লোক হল, কিছুদিন খুব ধুমধাম, তারপর সব ধুস্। আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। শয়তানের সঙ্গে ভগবানের যেমন লড়াই চলছে, ইংরেজিতে নিশ্চয়ই পড়েছিস তুই, তেমনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীরও লড়াই চলছে। রীতিমত লড়াই। প্রত্যেক মানুষের জীবনই সেই যুদ্ধক্ষেত্র। অলক্ষ্মীও কম নন, তাঁর শক্তিও তুচ্ছ করবার মতো নয়। কত রকম ছদ্মবেশে এসে তিনি যে মানুষকে ভোলান তার আর ইয়ত্তা নেই। কাম প্রেমের রূপধরে আসে অহঙ্কার আসে আত্মজ্ঞানের ছদ্মবেশে, ক্রোধ আসে বীরত্বের মুখোশ পরে' অলক্ষ্মীর জালই তো সারা সংসারে পাতা। কিন্তু সেই জালেরই ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম পথ আছে, সেই পথে আসেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে চঞ্চলা কেন বলেছে জানিস? অলক্ষ্মীই লক্ষ্মীকে চঞ্চলা করে' তোলে! সুস্থির হয়ে থাকতে দেয় কি কোথাও? আমি যখন শুয়োরের দাঁত নিয়ে ফিরলাম তখন পূর্ণ-পুরুত পুজো প্রায় শেষ করে' এনেছে—ভুল উচ্চারণ করে' অলক্ষ্মীকে অনুরোধ করছে—

ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী
সুখ রাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ন পূজ্যঞ্চ শাশ্বতীম্॥

রীতিমত অনুরোধ—এমন সুখের রাত্রে তুমি এখানে থেকো না, তোমার প্রাপ্য পূজো তোমাকে দিচ্ছি. তুমি স্ব-স্থানে চলে' যাও দয়া করে'..."

সুখেন চুপ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল আবার।

"সেদিন মামীমা সাজিয়েও ছিলেন অদ্ভুত। আলপনা-গুলো মনে হচ্ছিল জীবন্ত। পদ্মের কুঁড়িগুলি যেন এখুনি ফুটবে, লক্ষ্মীর পদচিহ্নের ধারে ধারে আলতার আভা যেন দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্মীর চৌকির উপর মুকুট আর পা'দুটি কি অদ্ভুতই যে দেখাচ্ছিল। সবই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সেদিন। লক্ষ্মীর কড়িবসানো ঝাঁপি, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর সরার উপর লাল নীল সবুজ হলুদ কালো দাগগুলি, স্তূপীকৃত খই, স্তূপীকৃত ধান চিঁড়ে, লক্ষ্মীর কাপড়ের রং সবুজ, গায়ের রং সোনার মতো—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল ওরা সবাই যেন অপেক্ষা করছে কারও, এমন কি ঘটের উপর যে রুক্ষ নারকেলটা ছিল সেটাও যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।"

সুখেন চুপ করল আবার। মনে হল নিজের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। মাথা হেঁট করে' চোখ বুজে বসে' আছে দেখলাম। যতটা কম শব্দ করে' সম্ভব ততটা কম শব্দ করে' আমি একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালাম একটি। সেই সামান্য 'খুস্' শব্দেই কিন্তু সুখেনের ধ্যান ভঙ্গ হল। সে আমার দিকে চেয়ে মুখটা ঈষৎ উঁচু করে' গলাটা ধীরে ধীরে চুলকুলে খানিকক্ষণ। তারপর ঈষৎ হেসে বললে—"আমি শুধু অদ্ভুত যোগাযোগের কথাটাই ভাবছি। বাগানের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় চকচকে এক জোড়া চোখ দেখে আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম খুবই,

পুজো শেষ হয়ে গেলেই আমি বাগানে যেতামও একবার নিশ্চয়ই। কিন্তু সরে' পড়বার মতলব, মানে পুজোটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দেওয়ার ইচ্ছে আমার হ'ত না যদি না মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মামা কটমট করে' চেয়ে দেখলেন আমার দিকে একবার। তারপর বললেন, শক্তিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? আমি বললাম, না, হয় নি। মামা বললেন, তিনি পুজোর প্রসাদ নিতে এখুনি আসবেন, তাঁর কাছ থেকে জেনে নিও পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ফেল করেছ। বুঝলে? চুপ করে' রইলাম। মামা সংবাদটি দিয়ে ভিতরে চলে' যাওয়া মাত্র ঠিক করে' ফেললাম পুজোটি শেষ হওয়া মাত্র প্রসাদটি নিয়েই চম্পট দিতে হবে। সেই রাত্রে শক্তিধর সান্যালের সম্মুখীন হবার সাহস আমার ছিল না। শক্তিধর প্রকৃতই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, এক ঘুষিতে কার যেন পাঁজরার হাড় ভেঙে দিয়েছিলেন শুনেছিলাম। শাঁখ বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই মামীমার হাত থেকে প্রসাদের খুরিটি নিয়ে লম্বা দিলাম। তখন ন্যাপলা ছিল আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। তার কাছেই গেলাম। খুলে বললাম তাকে সব কথা। সে বললে—ভালই হয়েছে তুই এসেছিস। আমাদের লোক হচ্ছিল না। ফণী আর বিশু আসবে একটু পরে। আমাদের চিলে-কোঠার ঘরটাতে টোয়েন্‌টি নাইন খেলব চল। তাস যোগাড় করেছি। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, রাত জাগতে হয়—"। টোয়েন্‌টি নাইন খেলাটা তখন খুব চলেছিল দিন কতক!"

আবার চুপ করলে সুখেন্দু। চুপ করে চেয়ে রইল মাঠের দিকে। আমিও চাইলাম। মনে হল সন্ধ্যার দিকে জ্যোৎস্না ফিকে ছিল, এখন যেন ঘন হয়েছে। কিশোরী যুবতী হয়েছে যেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগলাম মৃদুলা জেগে আছে। পিছনের ঘরে কি একটা করছে যেন গোপনে গোপনে। হাওয়া বইছে না, কিন্তু তবু যেন সেই

চেনা-অথচ-অচেনা সৌরভটা ভেসে এসেছে, ঘিরে ধরেছে আমাকে।

হঠাৎ সুখেন বলে' উঠল—"কে যেন আসছে মনে হচ্ছে—"

আমিও দেখলাম কে যেন আসছে।

"নিরু কি?"

"না, নিরু বলে' মনে হচ্ছে না। এর গায়ে ওড়না দেখছি—",

নারী মূর্তিটি আরও কাছাকাছি হ'তে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম যে এ অন্য লোক, নিরু বা ফুলু নয়।

সুখেন বলে' উঠল, "ও বুঝেছি এ সেই পাগলী বেগম—"

বেগম কছাকাছি এসে বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—"আদাব। আপনারা এখানে এসেছেন বুঝি আজ।"

"হ্যাঁ। আপনি কোথা যাচ্ছেন—"

"আমি বাদশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

বলে' মুচকি হেসে বাংলোর ডানদিক দিয়ে চলে গেল। তার ওড়নার মিহি কাপড় দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত মিহি কাপড় আমি আর দেখিনি। তার পায়ের নাগরা জুতো জোড়াও বিস্ময়কর! জুতোর গায়ে যে চুমকি বসানো ছিল, মনে হচ্ছিল তা যেন চুমকি নয় নক্ষত্রের সারি।

"বেগম সাহেবটি কে, চেন নাকি?"

"ঠিক চিনি না। তবে এমনি পূর্ণিমা রাত্রে ওকে আরও দুএকবার দেখেছি এখানে। কেউ বলে পাগলী কেউ বলে ভূত।"

"থাকে কোথায়. পাগলী হলে তো দিনেও দেখা যাবে।"

"দিনে কি সব জিনিস দেখা যায়? দিনে জোনাকী দেখেছিস, প্যাঁচা দেখেছিস?"

"কিন্তু ও তো প্যাঁচাও নয়, জোনাকীও নয়, ও মানুষ।"

"সব মানুষও দিনের বেলায় বেরোয় না। আমি একটি সাধুকে জানতাম সে সমস্ত দিন একটা গুহায় লুকিয়ে থাকত। বার হ'ত গভীর রাত্রে। দুনিয়াতে কত রকম আছে—"

দুজনেই চুপ করে' রইলাম কয়েক সেকেণ্ড।

সুখেন তারপর বললে, "হতে পারে ভূত। এ স্থানটা কবরস্থান ছিল। কিছুতেই আর অবিশ্বাস হয় না রে ভাই। নিজের চোখে ছেলেবেলায় সেই কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে যা দেখেছি তাতে চট করে' কোন কিছুকে হেসে উড়িয়ে দেবার সাহস নেই আর।"

"তোমার গল্পটা শেষ কর। তারপর কি হল—"

"নেপালের বাড়িতে সমস্ত রাত কাটানো গেল না। ঘণ্টা খানেক তাস খেলেছিলাম বোধ হয় আমরা। তারপরই নেপালের মা তাড়া লাগাতে লাগলেন। তাঁর তাড়ায় নেপালের বাবার ঘুম ভেঙে গেল। সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ পেয়ে দুদ্দাড় করে' উঠে পড়লাম আমরা। ফণে আর বিশে বাড়ি চলে গেল। আমি পড়লাম সমস্যায়। শক্তিধর সান্যালের গোবদা মুখটা মনে পড়ল। মনে হল, তিনি নিশ্চয় এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে বসে নেই, কিন্তু মামা তো আছেন। গিয়ে হয়তো দেখব সামনের বারান্দাতেই চেয়ারে বসে' পা দোলাচ্ছেন। বাড়ি ফেরা নিরাপদ মনে হল না। কি করা যায়। হঠাৎ মনে হল বাগানের ভিতরটা একবার ঘুরে আসা যাক। বনবেড়ালটা এখনও আছে কি? গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কি করি, ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। আম বাগানের পাশেই খানিকটা জমিতে মামা গোলাপ বাগান করেছিলেন। সেখানেও উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলাম, বনবেড়াল টেরাল কিছু দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু একটা

জিনিস যা দেখলাম তা অপূর্ব। খুব বড় ধবধবে সাদা গোলাপ ফুটেছিল একটি। স্নো কুইন। মনে হচ্ছিল জ্যোৎস্নাই ফুল হয়ে ফুটেছে বুঝি। আমি কাছে যেতেই ফুলটা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। মনে হল নীরব ভাষায় যেন বলতে লাগল, আমায় তুলে নাও তুমি। ফেলে যেও না, তুলে নাও। মামার ভয়ে তার গোলাপ গাছে হাত দিতাম না কেউ আমরা। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফুলটা ধীরে ধীরে দোল খেতে লাগল। তুলেই নিলাম শেষে। ভাবলাম বলব যে লক্ষ্মী পুজোয় দেবার জন্যে তুলেছি। আর একটা কথা মনে পড়াতেও নির্ভয় হলাম খানিকটা। মনে হল কাল অন্তত আমার কোনও ভয় নেই। আমার জন্ম হয়েছিল পূর্ণিমার ভোরে, তাই প্রতিমাসে পূর্ণিমার পরদিন মা আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে' কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় ফুলের মালা দিয়ে পায়েশ করে' খাওয়াতেন। মা মারা যাবার পর যখন মামীর কাছে এলাম তখন তিনিও সেটা বজায় রেখেছিলেন কিছুদিন। তাই আমার ভরসা হল যে কাল পায়েশ না খাই মার অন্তত খাব না। স্নো কুইনকে তুলে নিলাম। ফুলটি হাতে করে' বাগান থেকে যখন বেরোলাম তখনও দেখতে পাই নি কিছু। অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ির দিকেই আসছিলাম। ভাবছিলাম এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, আমিও গিয়ে মা লক্ষ্মীর ঘটের উপর ফুলটি রেখে চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়ব। কিন্তু কিছুদূর এসেই দেখতে পেলাম—ধবধবে বড় শাদা প্যাঁচা একটা গুট গুট করে আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর পিছু পিছু চলেছে ছোট মেয়ে একটি। বছর খানেক কি বড় জোর বছর দেড়েকের মেয়ে একটি। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অত বড় প্যাঁচা আমি দেখিনি কখনও, প্রথমে মনে হয়েছিল রাজহাঁস। কিন্তু সে

যখন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মেয়েটির দিকে, মাঝে মাঝে সে ফিরে ফিরে দেখছিল মেয়েটি আসছে কিনা তার সঙ্গে, তখন দেখলাম এতো রাজহাঁস নয়। গোল মুখ, টিকোলো নাকের মতো ঠোঁট, জ্বল্ জ্বল্ করছে চোখ। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু দূরে। মনে হল প্যাঁচাটা দু'একবার আমার দিকেও চাইলে! ভাবটা যেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন, তুমিও এস না। আমিও পিছু নিলাম। তখন দেখলাম মেয়েটি ছোট হলে কি হবে দিব্যি গুছিয়ে শাড়ি পরেছেন একটি। প্রতি অঙ্গে গয়না, চাঁদের আলো পড়ে চকমক করছে সেগুলো। মনে হল মাথায় ছোট মুকুটও যেন রয়েছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়—গায়ে হাত দিয়ে দেখ আমার—"

সুখেন আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখলে। দেখলাম সত্যিই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

"অদ্ভুত সে দৃশ্য। কল্পনা করতে চেষ্টা কর। চারদিকে জ্যোৎস্না উথলে পড়েছে। একটা ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড বড় প্যাঁচা গুট গুট করে' চলেছে, তার পিছু পিছু চলেছে ছোট্ট মেয়েটি, আর তাদের পিছু পিছু চলেছি আমি। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম প্যাঁচাটা আমাদের বাড়ির দিকে ঘুরল। গেটটাও দেখলাম হাঁ করে' খোলা রয়েছে। আমার জন্যই খুলে রেখেছিলেন বোধ হয় মামীমা। সেই গেট দিয়ে প্যাঁচা ঢুকল, আর তার পিছু পিছু সেই মেয়েটি। সামনেই পুজোর ঘর। পুজোর ঘরের কপাটও খোলা। মামীমা পাশের ঘরে ছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্যাঁচা সোজা গিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকল। সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে গেল যেন। আলপনার পদ্ম, কলমিলতা, দোপাটি-লতা সবাই হেসে উঠল, তাদের প্রতীক্ষা সার্থক হল যেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম প্যাঁচাটা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে আর সেই মেয়েটি লক্ষ্মীর পদ-চিহ্নগুলির উপর

পা রেখে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ঘটের দিকে। প্রদীপের আলো পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। দেখলাম শাড়ির রং সবুজ, সত্যিই মুকুট রয়েছে মাথায়, গয়না ঝলমল করছে সর্বাঙ্গে। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীর পটের মধ্যে অন্তর্ধান করলে মনে হল। তারপর দেখলাম প্যাঁচাটিও গুটি গুটি সেই দিকে যাচ্ছে। আমি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গোলাপ ফুলটা ঘটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে মামীমাকে ওঠালাম, যা যা দেখেছি সব বললাম খুলে। মামীমা ধড়মড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন পুজোর ঘরে—এসে দেখেন কোথাও কিছু নেই। কেবল লক্ষ্মীর পটের পিছনে ছেঁড়া কাপড় পরা ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে একটি। চুপচাপ বসেও নেই; নৈবেদ্যের উপরে যে মণ্ডাটি থাকে সেইটি তুলে নিয়ে খাচ্ছে। আমাদের দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমাকে আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। প্যাঁচা ট্যাচা কিছু নেই, মেয়েটিও অন্য রকম। মামীমা আমার দিকে কোপদৃষ্টি হেনে বললেন, "ফাজিল কোথাকার। কোথা থেকে নিয়ে এলি একে! কার মেয়ে—"

"আমি আনি নি। নিজেই এল—"

সত্যি কথাই বললাম আমি।

"ঠাকুর দেবতা নিয়ে মিছে কথা বলতে লজ্জা করে না? তোর কি ভয় ডর নেই—"

মামীমা ধমকে উঠলেন।

যতই বলি "সত্যি বলছি আমি আনি নি—ও নিজে এসেছে"—কিন্তু আমার কথা শোনে কে।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমা কিন্তু সকালেই রটিয়ে দিলেন সুখেন রাস্তা থেকে কার মেয়ে কুড়িয়ে এনেছে একটা। কি জাত তার ঠিক নেই—। কুড়ুনী বলে ডাকতে লাগলেন তাকে। তার কিছুদিন

পুরেই কিন্তু চোখ খুলল তাঁর। সেই স্নো কুইন গোলাপ গাছটা আস্তে আস্তে মরে গেল। বুড়ো হয়েছিল। মামা সেখানে আর একটা গাছ লাগাবেন বলে' খুঁড়ছিলেন জায়গাটা। মামা বাগানের কাজ নিজে হাতেই করতেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং করে' একটা শব্দ হল! তারপর সেখান থেকে কি বেরুল জানিস্? এক ঘড়া মোহর। দেনার দায়ে মামার চুল পর্যন্ত বিকিয়েছিল, সব শোধ করে' ফেললেন।"

চুপ করল সুখেন।

"তারপর। মেয়েটির কি হল?"

"হয়নি কিছু, আছে সে এখনও।"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর নীচু করে সুখেন বললে, "মৃদুলাই সেই মেয়ে। দ্বিজু, বিজু, রাজু কেউ জানে না একথা। ওরা তখন খুব ছোট ছিল তো, ওরা জানে মৃদুলা আমারই দূর-সম্পর্কের বোন..."

আমি আন্দাজ করেছিলাম। চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে সুখেন বললে—"কিন্তু এখন মুশকিল হয়েছে কি জানিস্, ওর জন্যে সৎপাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। ও মেয়েকে যার তার হাতে দিতে পারি না। তুই আমাদের পালটি ঘর, তুই যদি—"

সেই চেনা-অথচ-অচেনা গন্ধটা আরও নিবিড় হয়ে এল যেন আমার চারিদিকে।

বললাম, "আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুর বিয়ে না হলে আমি কি করে' বিয়ে করি। বিজেনের সঙ্গে ওর মাখা-মাখি হয়েছে দেখছি, তুমি যদি—"

"আরে হাঁ, হাঁ, সে তো আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি। আমাদের ঘরের লক্ষ্মী তোমাকে দেব, আমাদের লক্ষ্মীর আসন শূন্য থাকবে নাকি। ফুলু, নিরু দু'জনকে এনে বসাব তাতে। দু'টি মেয়েই লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী মেয়ে দেখলেই আমি চিনতে পারি। বিজেনের সম্বন্ধ এসেছিল একটা খুব বড়লোকের বাড়ি থেকে। তারা জমিদারী লিখে দিতে চাইছে বিজেনকে। কিন্তু মেয়েটি মূর্তিমতী একটি অলক্ষ্মী। ঠোঁটে রং, হ-ব-ল করা শাড়ি, বব্-করা চুল, মোটরে চড়ে দিনরাত টো টো করে বেড়াচ্ছে সিনেমায় পার্টিতে। ও মেয়ের সঙ্গে বিজেনের বিয়ে দি কখনও আমি? নিরুর কথা আমিই তোকে বলব ভাবছিলাম।"

অতিশয় উত্তেজনা ভরে সুখেন উঠে দাঁড়াল।

"উঠছ যে—যাচ্ছ কোথা?"

রামধনের বউটা কেমন আছে, খবর নিয়ে আসি একটু। তুই ঘুমো। এইখানেই শুবি, না বিছানা করে দিতে বলব—"

"এইখানেই বেশ আছি—"

সুখেন চলে' গেল। চুপ করে' বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। অমৃতসাগর থৈ থৈ করছে চারিদিকে। চিপ্ চিপ্ চিপ্—সেই পোকাটা অনেকক্ষণ পরে ইঙ্গিতে কি যেন বললে আবার। মৃদুলা পিছনের ঘরটায় কি করছে? ছবিটা আবার চোখের উপর ফুটে উঠল—সেই লক্ষ্মীর ছবিটা—যেটা আমার মায়ের ঘরে ছিল, মা যাতে রোজ সিঁদুরের টিপ দিতেন।

ফুলুর কথা

নিরুদি তো বেশ মজা করলে। এখুনি আসছি বলে' আমাকে এখানে একলাটি বসিয়ে কোথা চলে গেল। মৃদুলা যদিও আমাকে এখানে পাঠালে ওকে হাওয়া করবার জন্যে, কিন্তু এসে দেখি মৃদুলা সেই যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, আর ওঠে নি, সেই থেকে অগাধে ঘুমুচ্ছে। তবু বসে হাওয়া করলাম খানিকক্ষণ। সুখেনদা মাঝে এসেছিলেন একবার, এসে উঁকি দিয়েই চলে গেলেন। আমি একা বসে বসে কি করি এখন। কতক্ষণ হাওয়া করব। এই মাটি করেছে। ছেলেটা খুঁতখুঁত করছে। না ওঠে আবার। উঠে চীৎকার করলেই তো ঘুম ভাঙিয়ে দেবে মায়ের। ওই উঠে বসল। পালাই বাইরে নিয়ে। তা নাহলে ঠিক ঘুমটি ভাঙিয়ে দেবে। নিরুদি আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল তো আমাকে।...বাঃ বাইরে কি জ্যোৎস্না উঠেছে। পূর্ণিমা না কি আজ? নিশ্চয় পূর্ণিমা। শহরে তো পূর্ণিমা অমাবস্যা বোঝবার উপায় নেই।"

"ঘুমোও খোকন, ঘুমোও তো বাবা—"

কাঁধে করে নিয়ে পাইচারি করছি। তাছাড়া উপায় কি।

"ঘুমোও, আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোও তো বাবা। আমি গান করি ঘুমোও তুমি—"

কে বকেছে খোকাবাবুকে কে বলেছে যা তা
খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা

হিমসাগরের ঠান্ডা বাতাস হাত বুলুবে গায়ে
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আসবে স্বপন নায়ে—

না বাবা, এ ছেলে ঘুমুবে না। খিদে পেয়েছে নাকি!

হ্যাঁ।

কি খাও তুমি রাত্তিরে?

ডুডু।

এত রাত্তিরে 'ডুডু' পাই কোথা। ও বাবা, ছেলের ঠোঁট ফুলছে দেখছি। আচ্ছা, ডুডু দেব তোমাকে। বললাম তো, কিন্তু কোথা পাই দুধ। ঘরে আছে নিশ্চয়ই কোথাও, কিন্তু অন্ধকারে সে কি আমি খুঁজে পাব। জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করতে গেলেই রামধনের বউয়ের ঘুমটি ভেঙে যাবে ঠিক। কি করা যায়, মহা মুশকিল তো। নিরুদি কোথা যে গেল। ও, নিরুদি বোধহয় শ্বেতপদ্মের সন্ধানে ঘুরছে। ঠিক। মৃদুলা আমাকে বলেছিল ভোরের আগেই মালা গাঁথতে হবে। আমি কিন্তু একে নিয়ে কি করি এখন। দুধ পাই কোথা? কে আসছে দূরে? পালাই বাবা ঘরের ভেতর। একা ভয় করে আমার এই মাঠের বাবা ঘরের ভেতর। এক ভয় করে আমার এই মাঠের মাঝখানে। এই দিকেই আসছে। সরে দাঁড়াই একটু। ও, রাজু আমাদের! রাজু সিগারেট খেতে শিখেছে দেখছি।

"রাজু না কি—"

"ফুলুদি? তোমার কাছেই আসছি আমি। বিজেনদা তোমাকে বলতে বললেন, নিরুদি পদ্মফুল এনেছেন, তুমি মালা গাঁথবে চল।"

"তা যাচ্ছি। কিন্তু একে ঘুম না পাড়িয়ে যাই কি করে! একটু দুধ জোগাড় করতে পার? জোগাড় করা মুশাকল কিন্তু একে দুধ না খাওয়ালে ঘুমুবে না। ক্ষিধেয় উঠে পড়েছে।"

"কিচ্ছু মুশকিল নয়। তুমি আমাকে একটা ঘটি টটি দাও, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।"

"বাংলোয় এক ফোঁটা দুধ নেই। মৃদুলা সব পায়েশ করে ফেলেছে—"

"আমি অন্য জায়গা থেকে আনব।"

"কোথা থেকে?"

"ভজুয়ার অনেকগুলো ছাগল আছে দেখলাম। দুয়ে নিয়ে আসছি।"

ঘটি নিয়ে চলে গেল রাজু। কি উৎসাহ। চমৎকার ছেলে। এ বাড়ির সবাই চমৎকার। রাজু যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ বাইরেই ঘোরা-ফেরা করি। ঘরে যাওয়া নিরাপদ নয়। রামধনের বউ উঠে পড়লেই সর্বনাশ। মালা গাঁথা মাথায় উঠবে তা'হলে। রামধন থাকলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর মৃদুলা কোথায় যে তাকে পাঠালে, এখনও ফেরবার নামটি নেই তার। না, দুষ্টুমি করো না। ছি, বুকের কাপড় ধরে' টানতে নেই, লক্ষ্মী ছেলে, আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে' শুয়ে থাক। আমি গান করি কেমন? রাজু এক্ষুণি দুধ নিয়ে আসবে।

পা টিপব গা টিপব চুল কুরিয়ে দেব
পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে সুড়সুড়িয়ে দেব
চুলকে দেব কানের গোড়া, বুজবে চোখের পাতা
খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আসছে চাঁদের আলোয়
ঘুমের লিখন লিখবে এসে কাজলটুকুর কালোয়—

ওই রাজু আসছে। সাইকেল পেলে কোথা থেকে। ভজুয়ারই বোধ হয়। ও-মা, এক ঘটি দুধ এনেছে প্রায়। কিন্তু একটা কথা তখন খেয়াল হয় নি, এখন মনে পড়ছে। বললাম, "রাজু দুধ তো আনলে, কিন্তু গরম করতে হবে যে। কাঁচা দুধ খাওয়ানো যাবে না তো।"

এক্ষুণি সব ঠিক করে দিচ্ছি। রামধনের বাড়ির পিছনে ঘুঁটে থাক-করা আছে। এখুনি ধরিয়ে দিচ্ছি।"

রাজু বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে ঘুঁটে কাঠ-কুটো কাগজ নিয়ে এল। ইঁটও নিয়ে এল দু'খানা।

"দেশলাই আছে?"

"আছে।"

পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। চট করে আমার মুখের দিকে চাইলে একবার। তারপর কাগজ ধরিয়ে নিমেষে ধরিয়ে ফেলল ঘুঁটে। ইঁট দিয়ে উনুনই করে ফেললে একটা। কি চটপটে ছেলে। ঘটিটাই চড়িয়ে দিলে ঘুঁটের আগুনে। দেখতে দেখতে উথলে উঠল দুধ। ভাগ্যে আঁচল দিয়ে ধরে টপ্ করে' নাবিয়ে ফেললাম ঘটিটা, তা না হলে আগুনে পড়ে যেত খানিকটা দুধ। আর এক সমস্যা। এই গরম আগুন দুধ, ওকে খাওয়াই কি করে'। রাজুকে সে কথা বলতেই সে বললে—রামধন চা খায়, ওর কাপ ডিশ নিশ্চয় আছে। ঘরে ঢুকে বার করে' নিয়ে এল।

"আর কোনও কাজ আছে?" জিগ্যেস করলে তারপর।

"না। ঘুমোও নি তুমি—?"

ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। বিজেনদার কাছে কোয়ানটম্ থিয়োরিটা বুঝছি—"

"নিরুদি কোথায়—"

"এক বোঝা ফুল নিয়ে এখুনি তো মৃদুলাদির কাছে গেল। তোমাকে সেই খবরটাই তো দিতে এসেছি। আমি যাই তাহলে।"

"যাও। আমি একে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি—"

ডিশে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে' করে' ওকে দুধ খাওয়াতে লাগলাম। রাজু চলে গেল।

"এ কি, এখানে কি হচ্ছে—"

বাবা, চমকে উঠেছি! ফিরে দেখি সুখেনদা দাঁড়িয়ে আছেন।

"এ উঠে পড়েছিল তাই একে দুধ খাওয়াচ্ছি।"

"রামধনের বউ কেমন আছে?"

"ঘুমুচ্ছে। ভালই আছে।"

সুখেনদা'র চোখে মুখে আনন্দ ঝলমল করছে মনে হল।

"তুমি যে অমন চমৎকার সোয়েটার বুনতে পার তা তো জানতাম না। চমৎকার হয়েছে পানি-শঙ্খ প্যাটার্ন। আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ। খুব খুশী হয়েছি, হিংসে হচ্ছে—"

সুখেনদা হেসে চলে গেলেন।

দুধটি পেটে পড়তেই ছেলে ঘুমুল। তাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে হাওয়া করছি, এমন সময় মোটর-বাইকের শব্দ শোনা গেল। এই দিকেই আসছে না কি! হ্যাঁ—ওই যে। কি জোরেই আসছে, কি দরকার অত জোরে চালাবার, দেখতে দেখতে এসে পড়ল। আমাকে দেখতে পেয়ে নেবেছে। আসছে এই দিকেই। কি অস্থির লোক, হাঁটছে না তো দৌড়ুচ্ছে যেন।

"কে ফুলু?"

"হ্যাঁ।"

"আর কে আছে?"

"আর কেউ নেই।"

"কেমন আছে রামধনের বউ?"

"ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটাও ঘুমিয়েছে—"

"চল তবে এক চক্কোর দিয়ে আসি।"

"না, না, এখন আমাকে মালা গাঁথতে যেতে হবে। মৃদুলা নিরুদি বাংলোয় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে—"

‘‘দশ মিনিটে এক চক্কোর দিয়ে পৌঁছে দেব তোমাকে সেখানে। চল—“

‘‘না, সে বড় লজ্জা করবে আমার। তোমার গাড়িতে বসে’ আমি ওখানে যেতে পারব না।”

“আচ্ছা, বেশ এইখানেই নাবিয়ে দেব তাহলে।”

‘‘থাক না আজ। কি যে পাগলের মতো করো—”

‘‘চল, চল, প্লীজ—”

যেতেই হল। কি স্পীড্ গাড়িটার, সব উলটে পালটে দিচ্ছে যেন।

ষোল

অবনীশের কথা

ঘুমুচ্ছি, না জেগে আছি বুঝতে পারছি না ঠিক। নূতন জগতে এসেছি যেন।

আধ-বোঁজা চোখের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার নূতন রূপ। বিগলিত আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেছে। আনন্দের সাগর। সামনের মাঠে ও তিনটে চেয়ার নয় তিনটে পদ্ম যেন। তাতে বসে আছে মৃদুলা, নিরু আর ফুলু। দেখতে দেখতে তিনজন মিশে এক হয়ে গেল। অপূর্ব রূপসী একজন। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পরনে সবুজ শাড়ি, মাথায় মুকুট, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, গৌরবর্ণা। হাতে পদ্ম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে, পা ফেলছে চন্দনে আঁকা পদ্মপত্রের উপর...।

আসছে, আসছে, আসছে...।

হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে গেল।

উঠে বসলাম। ভিতরের দিকে সুখেনের গলা পেলাম।

"অবন কোথা গেল, তাকেও ডাক—"

তারপর সুখেন নিজেই বেরিয়ে এল।

"মৃ কি কাণ্ড করেছে দেখ। আমার যে আজ জন্মদিন তা মনেই ছিল না। ও এর মধ্যে কখন পায়েশ করেছে, খাবার আনিয়েছে, পদ্মফুল তুলিয়ে মালা গেঁথেছে কিছুই জানতে পারিনি।"

দেখি সুখেনের গলায় শ্বেতপদ্মের মালা দুলছে।

"চল আমাদের খেতে দিয়েছে। চোখে মুখে জল দিয়ে নে একটু।"

চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, কার্পেটের আসনে দ্বিজু, বিজু আর রাজু বসে আছে। প্রত্যেকের গলায় পদ্মের মালা।

''তুমিও এটা পরে' ফেল।"

সুখেন একটা মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলে।

''চল বসা যাক এবার। ওই আসনটায় তুই বস'। ওটা একটু বেশী রঙিন মনে হচ্ছে—"

বসলাম। আবার শাঁখ বেজে উঠল।

"ঠিক চারটে তেতাল্লিশ। ঠিক এই সময়ে জন্ম আমার। সুখেনের কথা শেষ হতে না হতে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মৃদুলা, নিরু আর ফুলু। প্রত্যেকের হাতে পরমান্নের বাটি।

সমাপ্ত
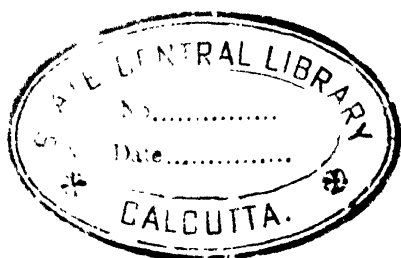
এই লেখকের অন্যান্য বই

পঞ্চপর্ব	—	৫॥০
তন্বী	—	৩॥০
কষ্টিপাথর	—	২॥০
ডানা ১ম	—	৩॥০
,, ২য়	—	৪॥০
নবদিগন্ত	—	৫॥০
শ্রীমধুসূদন	—	৩৲
বিদ্যাসাগর	—	৩৲
নির্মোক	—	৪॥০